# তুরুপের শেষ তাস

শেফালিকা শেঠ

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০

প্রকাশক : শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ
বিনয়-ভবন
৪৫ গিরিশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সুদক্ষিণাকে
জেঠু

কিকিরার গলা শোনা যাচ্ছিল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। তারাপদ ভেতরে গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। বগলা কাছেই ছিল ; ইশারায় ডাকল তাকে। নিচু গলায় বলল, "কে বগলাদা ?"

বগলা দেখল তারাপদকে। কী বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে গম্ভীর মুখ করে বলল, "জানি না।"

"নতুন লোক ?"

"যাও না, ভেতরে গিয়ে দ্যাখো।"

ভেতরে যাওয়া উচিত হবে কি না তারাপদ বুঝতে পারছিল না। কিকিরার এই ফ্ল্যাটে আড়াইটে কি তিনটে ঘর। বগলাদার সরু-মতন ঘরটাকে আধখানা ধরলে আড়াই, নয়তো তিন। কিকিরার দুটো ঘর। একটা তাঁর শোওয়ার ঘর, অন্যটা বসার—মানে কিকিরা-মিউজিয়াম। বাকি যা থাকল তা রান্নাঘর আর বাথরুম।

তারাপদ হালকাভাবে বলল, "বগলাদা, তোমার কর্তাবাবুকে বলো না একটা অফিসঘর করতে। এভাবে চলে না। আমরা

এসে দাঁড়িয়ে থাকব !”

বগলা বলল, “দাঁড়াবে কেন, চলে যাও ভেতরে। তোমাদের তো ফ্রি পাস।”

'ফ্রি পাস' কথাটা শুনে তারাপদ হেসে ফেলল।

বগলার এখন দাঁড়াবার সময় নেই। হাতে একটা প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ, কিছু কেনাকাটা করতে বাইরে যাবে।

ইশারায় তারাপদকে এগোতে বলে বগলা সদরের দিকে চলে গেল।

তারাপদ কিকিরার বসার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বার-দুই কাশল। মানে সাড়া দিল। তারপর পা বাড়াল।

ঘরে ঢুকে তারাপদ অবাক! কিকিরা একা। তাঁর সেই রাজসিংহাসনে বসে আছেন জোব্বা চাপিয়ে। হাতে একটা কাচের গ্লাস। গ্লাসটা তাঁর মুখের সামনে।

যেন আকাশ থেকে পড়েছে তারাপদ, অবাক হয়ে বলল, “এ কী! আপনি একা। আমি ভাবলাম কারও সঙ্গে কথা বলছেন! বগলাদাও আমাকে আচ্ছা জব্দ করল তো!”

কিকিরা হাসলেন।

“আপনি কি যাত্রা থিয়েটার করছিলেন, সার?”

মাথা নাড়লেন কিকিরা। “না হে তারাবাবু, প্র্যাকটিস করছিলাম। সব ভুলে যাচ্ছি। চর্চা না থাকলে কি আর পারা যায়!”

“কিসের চর্চা করছিলেন?”

“ভেন্‌ট্রো...।”

“ভেনট্রো! সে আবার কোন পদার্থ?”

“ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। শর্ট করে ভেন্‌ট্রো। আজকাল তো তোমাদের সবই শর্ট। ক্যালি, ফ্যান্টা, কত কী!”

তারাপদ রগড় করে বলল, "তা হঠাৎ এই দু-নম্বরি গলা করার চেষ্টা কেন, স্যার ? আপনার গলা তো বেশ ভাল ! রামপ্রসাদী থেকে নিধুবাবু—সবই গাইতে পারেন ।"

কিকিরা হাতের গ্লাসটা জোব্বার পকেটে ঢুকিয়ে অন্য একটা ছোট মোটা গ্লাস আরেক পকেট থেকে বের করে নিলেন । নিয়ে মুখের সামনে ধরলেন । দু-চারবার চেষ্টা করার পর অন্যরকম এক গলা শোনা গেল । শোনা গেল কে যেন বলছে, "তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক টাকার । যখন চাইব তখনই তোমায় দিতে হবে । না দিলে কী হবে—তুমি ভাল করেই জানো ।"

তারাপদ বুঝতে পারল, কিকিরা চেষ্টা করেও পুরোপুরি গলার স্বর পালটাতে পারছেন না । সেটাই স্বাভাবিক । অনভ্যাসে এরকমই হওয়ার কথা । তারাপদ হাসিমুখে বলল, "স্যার, আপনি কি কাউকে ব্ল্যাকমেল করবেন ঠিক করেছেন ?"

কিকিরা মুখের সামনে থেকে কাচের গ্লাস সরিয়ে নিলেন । বললেন, "তারা, সেই ভুজঙ্গ কাপালিকের কথা মনে আছে ! সেঁয়াশ ! ভুজঙ্গ একেবারে এক্সপার্ট ছিল এ-ব্যাপারে । আমি ঠিক পারছি না । অভ্যেস নেই ।"

"ও, এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করছেন নাকি ?"

"ওই একটু-আধটু ।" কিকিরা গ্লাস রেখে দিলেন । বললেন, "ওই—ওই যে—ওখানে বুকসেল্‌ফের মাথায় একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ রয়েছে, ওটা নিয়ে এসো ।"

তারাপদ কিছুই বুঝল না, তবু এগিয়ে গিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে এল ।

"বোসো," কিকিরা বললেন, "পাতা ওলটাতে হবে না । ওই পাতাতেই দাগ দেওয়া আছে একটা জায়গায় । সেটা পড়ো ।"

তারাপদ বসল । কাগজে দাগ দেওয়া জায়গাটাও দেখতে

পেল। খানিকটা জায়গা জুড়ে বড়-বড় অক্ষরে কিসের যেন বিজ্ঞপ্তি। পড়তে গিয়ে বুঝল, ঠিক বিজ্ঞপ্তি নয়, শোকপ্রকাশ। অর্থাৎ কেউ মারা গিয়েছিল, তার স্মৃতির উদ্দেশে মৃতের ঘনিষ্ঠজন শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কাগজে আজকাল হামেশাই এসব দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ সময়েই তার আকারটা হয় ছোট। এটা সে-তুলনায় বড়।

কিকিরা বললেন, "পড়লে ?"

"পড়লাম।"

"আবার পড়ো। জোরে-জোরে।"

তারাপদ পড়ল : "আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মেজোবাবু ও রাহা ব্রাদার্সের অন্যতম মালিক ধরণীমোহন সেন গতবছর (পয়লা ফাল্গুন) ঠিক আজকের দিনটিতে—অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর মৃত্যুদিনটি আমাদের পক্ষে মহা শোকের দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর মানুষের হাত নেই। তবু, দুঃখ হয় এই ভেবে যে, মেজোবাবুর মৃত্যু বড় রহস্যময়। এই রহস্যের কোনও হদিস আজ পর্যন্ত করা গেল না। মেজোবাবুর মৃত্যুদিনে তাঁর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। মহিমচন্দ্র রাহা ও রাহা ব্রাদার্সের কর্মিবৃন্দ। ১ ফাল্গুন, ১৩১৯।"

পড়া শেষ করে তারাপদ কিকিরার দিকে তাকাল।

কিকিরা সামান্য চুপচাপ থাকার পর বললেন, "কী মনে হল ?"

"এটা কবেকার কাগজ ?"

"গত হপ্তার। আজ ফাল্গুন মাসের আট তারিখ।"

"আপনি নিজে...।"

"না না, আমি মোটামুটি সবই দেখি ; তবে ওই কাগজটা আমায় মহিমচন্দ্র রাহা দিয়ে গিয়েছেন।"

"মহিমচন্দ্র ?"

"হ্যাঁ। নিজের হাতে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনার চেনা ?"

"না। আমার এক বন্ধুর মুখে আমার কথা শুনে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"কবে ?"

"আজই। তুমি আসার খানিকটা আগে চলে গেলেন।"

তারাপদ অন্যমনস্কভাবে হাতের ঘড়িটা দেখল। এখন সোয়া ছয়। ফাল্গুন মাস বলে এখনও আলো আছে। তবে ম্লান হয়ে এসেছে। মহিমচন্দ্র হয়তো, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চলে গেছেন। তারাপদ খানিকটা আগে এলে ভদ্রলোককে দেখতে পেত।

তারাপদ বলল, "মহিমচন্দ্র কি আপনার নতুন ক্লায়েন্ট ?"

"আমার নয়, আমাদের।"

"কেটিসি এজেন্সির ?" তারাপদ হাসল।

কিকিরাও তামাশা করে বললেন, "এজেন্সি নয়, সার্ভিস। কেটিসি সার্ভিস। সার্ভিসের মধ্যে একটা সামাজিক কর্তব্যের ভাব আছে বুঝলে না !" বলে তিনি জামার নানা পকেট হাতড়ে নিজের চুরুট আর দেশলাই বের করলেন। "সোশ্যাল ব্যাপার তারাবাবু—।"

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "স্যার, এবার থেকে আপনার সোশ্যাল মক্কেলদের কাছ থেকে একটা এগ্রিমেন্ট সই করিয়ে নেবেন। আর অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে নেবেন—হাজার পাঁচেক। সোশ্যাল ডোনেশান। নয়তো সার্ভিস চালু রাখা যাবে না।"

চুরুট ধরাতে ধরাতে কিকিরা বললেন, "হবে, হয়ে যাবে তারাবাবু। মহিমচন্দ্র গত এক বছরে হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দান করেছেন। অবশ্য দান নয়, অনুদান। বা বলতে পারো,

তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে।”

তারাপদ যেন চমকে উঠল। টাকার অঙ্কটা মগজে গোলমাল পাকিয়ে ফেলছিল। গলার স্বর আটকে যাচ্ছিল। “চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা!”

“হ্যাঁ।”

“কে করেছে? মানে কে ব্ল্যাকমেল করেছে?”

“শেখর গুহ বলে একটা লোক। মহিমচন্দ্র সেইরকম বলেন!”

“মানে? বলেন মানে! ব্ল্যাকমেল করে যে টাকা নিচ্ছে, তাকে মহিমচন্দ্র ধরতে পারেন না? টাকা দিচ্ছেন, অথচ—! আমার মাথায় ঢুকছে না, কিকিরা।”

কিকিরা চুরুট টানলেন বার-কয়েক। পরে বললেন, “শেখর গুহ লোকটাকে ভালই চেনেন মহিমচন্দ্র। হাড়ে-হাড়ে চেনেন। কিন্তু টাকা নেওয়ার সময় সে লোক-মারফত নিচ্ছে। নিজে হাজির থাকছে না। মহিমচন্দ্র তাই বললেন।”

“অদ্ভুত ব্যাপার তো!”

“আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে, তারা। ওই যে কাগজে যেটা পড়লে, সেটা কিন্তু মহিমচন্দ্র বা রাহা ব্রাদার্সের কর্মীদের কেউ ছাপতে দেয়নি।”

তারাপদ যেন কেমন বোকা হয়ে গেল। কাগজে একটা স্মৃতিশ্রদ্ধার বিজ্ঞপ্তি ছাপা হল, অথচ যাদের নাম রয়েছে, তারা কেউ সেটা ছাপতে দেয়নি, এ কেমন করে হয়!

অবিশ্বাসের গলা করে তারাপদ বলল, “কী বলছেন আপনি?”

“আমি বলিনি, মহিমচন্দ্র বলছেন।”

“তিনি বলেন কেমন করে? ভূতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এল কাগজে?”

"মহিমচন্দ্র বলছেন, তিনি কাগজের অফিসে খোঁজ করেছেন লোক পাঠিয়ে। কাগজওয়ালারা বলেছে, একজন এসে নগদ টাকা দিয়ে ওটা ছাপতে দিয়ে গিয়েছিল। ওই বিজ্ঞপ্তিটায় আপত্তিকর তো কিছু নেই। বরং এসব ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তির একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে। কাগজওয়ালারা ছেপেছে। বিজ্ঞপ্তি যে দিয়ে গিয়েছিল, তার নাম-ঠিকানাও খাতা আর রসিদ বইয়ের ডুপ্লিকেট দেখে দিয়ে দিয়েছে কাগজের অফিস।"

তারাপদ বলল, "কে দিয়েছিল ?"

"যেই দিক, নামটা আসল নয়, নকল। ঠিকানাও ফল্‌স। মহিমচন্দ্র খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, ওই ঠিকানা আর নাম দুটোই মিথ্যে।"

তারাপদ কোনও কথা বলল না। তার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। সবই কেমন গোলমেলে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তারাপদ বলল, "স্যার, কাগজে ঘটা করে ওই শোক জানানোর কী মানে ? যারা জানাবার তারাই যখন জানাল না, বাইরের লোক লুকিয়ে তা জানাতে যাবে কেন ?"

কিকিরা বললেন, "কেন তা বুঝতে পারলে না ?"

"না।"

"মাথায় কী আছে হে !"

"গোবর।"

তামাশায় কান দিলেন না কিকিরা। "আমার মনে হয়," উনি বললেন, "ওটা নিতান্ত বাৎসরিক শ্রদ্ধাশোক জানানো নয় হে, চালাকি করে একটা সন্দেহ জানিয়ে দেওয়া।"

"সন্দেহ !"

"হ্যাঁ, ওই যে লিখেছে মৃত্যু-রহস্যের কোনও হদিস হল না !

লিখেছে না ?”

তারাপদর খেয়াল হল। “হ্যাঁ, লিখেছে।”

“তার মানে মহিমচন্দ্রদের ভয় দেখানো যে : বাপু, ধরণীমোহনের মারা যাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, সেটা ভুলে যেয়ো না।” কিকিরা একটু থামলেন। আবার বললেন, “ওটা যে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছে সে খুব বুদ্ধিমান, পাকা লোক। জানাচ্ছে শোক, কিন্তু তলায়-তলায় সন্দেহটা বেশ পাকাপাকিভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। একেবারে ‘পাবলিক’ করে দিয়েছে হে তারাপদ। মহিমচন্দ্র বা রাহা ব্রাদার্সের লোকরা শুধু নয়, যে দেখবে সেই অবাক হবে, ভাববে, ধরণীমোহনের মৃত্যুর রহস্যটা তা হলে এমন কী যে, হদিস হল না !”

তারাপদ বুঝতে পারল মোটামুটি।

“মহিমচন্দ্র বুঝি এইজন্য এসেছিলেন ?” তারাপদ বলল।

“হ্যাঁ। তিনি এসেছিলেন এই কথা বলতে যে, ধরণীমোহন আচমকা মারা গেলেও সেটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে ওই লেখাগুলো ছাপানো হয়েছে। তার ফল হয়েছে এই যে, অনেকের ব্যাপারটা নজরে পড়েছে। কেউ-কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন। মহিমচন্দ্র নিজেও ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তিনি কিছু জানালেন না, অথচ তাঁর আর রাহা ব্রাদার্সের কর্মীদের নাম করে এইরকম একটা জিনিস ছাপিয়ে দেওয়া হল !”

তারাপদ বলল, “উনি কাকে সন্দেহ করছেন ? মানে, কে এমন কাজ করতে পারে বলে ওঁর মনে হয়।”

“শেখর গুহ।”

“ও ! শেখর গুহ ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেয়, আবার কাগজে নোটিস ছাপিয়ে ভয়ও দেখায়।”

"হ্যাঁ !"

"কেন ?"

"ভয় না দেখালে মহিমচন্দ্রের কাছ্ থেকে টাকা পাওয়া যাবে না।"

"টাকা তো পাচ্ছে।"

"এ-পর্যন্ত পেয়েছে। কিন্তু আর যদি না পায় ! ভয়টা মহিমের মনে সবসময় জাগিয়ে রাখতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে। ...আমার তাই মনে হয়।"

"শেখর যে টাকা চায়, কেমন করে চায় ?"

"কীভাবে চায় বলছ ? মহিমচন্দ্রকে ফোন করে টাকা চায়। নিজে টাকা নিতে যায় না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেয়।"

"স্যার, মহিমচন্দ্র কী ধরনের মানুষ ? তিনি একটা লোককে এইভাবে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন কেন ? কেনই বা পুলিশকে জানাচ্ছেন না !"

কিকিরা বললেন, "সেটাই তো কথা তারাপদ, মহিমচন্দ্র কী ধরনের মানুষ ! তাঁর অত ভয়ই বা কিসের ? কাকেই বা ভয় !"

চন্দন খানিকটা দেরি করে এলেও তারাপদ তাকে আরাম করে বসতেও দিল না। তার আগেই মহিমচন্দ্র-সংবাদ শুনিয়ে দিল। পড়তে দিল কাগজটাও।

চন্দন এমনিতে শান্ত ভদ্র ছেলে, স্বভাবে একেবারেই রুক্ষ নয় ; কিন্তু আজ রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল তুচ্ছ

কারণে। দোষ চন্দনের নয়। এক-একজন থাকে যারা খানিকটা তেরিয়া গোছের। সামান্যতেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সেইরকম এক লোকের সঙ্গে বৃথা ঝগড়া করে চন্দনের মেজাজ খারাপ হয়েছিল। মহিমচন্দ্রের ব্যাপারটা ও মন দিয়ে শুনল না।

চা খাওয়ার পর্ব মিটে যাওয়ার পর চন্দনের যেন খেয়াল হল। হঠাৎ বলল, "কিঁসের ব্ল্যাকমেল ?"

"বা ! কিসের ব্ল্যাকমেল। তুই কি ঘুমোচ্ছিলি নাকি ?"

"মন দিয়ে শুনিনি।"

"কেন, তোর মন কোথায় ? হাসপাতালে রোগী মেরেছিস ?"

"রাস্তায় একটা লোককে চড় কষিয়েছি। এমন বাজে লোক। পায়ে পা লাগিয়ে চেঁচাতে আসে !...যাক গে, কী কেস তোদের বল !"

তারাপদ আবার বলল।

সবটা অবশ্য বলতে হল না ; চন্দনের কিছু-কিছু মনে ছিল। মোটামুটি ব্যাপারটা সে বুঝে নিল।

"রাহা ব্রাদার্স-এর কিসের কারবার, কিকিরা ?" চন্দন জানতে চাইল।

কিকিরা বললেন, "রঙের কারবার।"

"রঙ ? কিসের রঙ ?"

"পেন্টস ! কারখানা আছে রঙের। বাজারে কিছু ছোটখাটো রঙের ব্যবসায়ী আছে ; সবাই তো এক নম্বর রঙ কিনতে পারে না। দামে খানিকটা সস্তা পড়ে এমন রঙ চায়। ছাপোষা লোকদের কাজে দেয়। মফস্বলে ভালই চলে।"

"কোথায় কারখানা ?"

"হাওড়া।"

চন্দন এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সিগারেট

ধরাতে-ধরাতে বলল, "মহিমচন্দ্র আর ধরণীমোহন—একজন রাহা অন্যজন সেন—কোম্পানির নাম রাহা ব্রাদার্স—ভেতরের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কিকিরা ? ধরণীমোহন কে ছিলেন ?"

কিকিরা বললেন, "ব্যাপার তেমন গোলমেলে নয়। পার্টনারশিপ বিজনেস। মহিমচন্দ্রের বড়দাদা ব্যবসাটা শুরু করেন। রাহা ব্রাদার্স নামে। পরে তাঁর বন্ধু ধরণীমোহন ব্যবসায় যোগ দেন। কোম্পানির নাম পালটানো হয়নি। মহিমচন্দ্রের বড়দাদা ছিলেন বড়বাবু। কারখানার লোক তাঁকে বড়বাবু বলে ডাকত। ধরণীমোহন আসার পর তিনি হলেন মেজোবাবু।"

"মহিমবাবু কি ছোটবাবু ?"

"তা হবে।...যা বলছিলাম, বড়বাবু মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। তিনি মারা যাওয়ার পর মেজোবাবু—মানে ধরণীমোহন কোম্পানির মাথা ছিলেন। তাঁর পরামর্শ মতনই কোম্পানি চলত। তা তিনিও গত বছর মারা যান।"

"কেমন করে ?"

"মহিমচন্দ্র বলছে, হঠাৎ মারা যান। হার্ট ফেল।"

"হার্ট ফেল না করলে আর মারা যাবেন কেন ? কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেলের কারণ ? কোনও অসুখ ছিল হার্টের ?"

"না, তেমন কিছু নয়। হাঁপানির একটা টেন্‌ডেন্‌সি ছিল। মাঝে-সাঝে ব্রিদিং ট্রাব্‌ল হত। সামান্য ব্লাড সুগার। তার বেশি কিছু ছিল বলে কেউ জানে না।"

চন্দন কী ভাবল, বলল, "কিকিরা, হার্টের ছোটখাটো গোলমাল বলে আমরা প্রথমে যা তেমন একটা পাত্তা দিই না, সেটা হয়তো আসলে কোনও বড় গোলমাল। আগে ঠিকমতন ধরতে না পারলে হঠাৎ বড় একটা কিছু হয়ে যেতেও পারে।"

তারাপদ বলল, "মানে তুই বলছিস, ধরণীমোহন স্বাভাবিক ভাবেই মারা যেতে পারেন !"

"অবশ্যই পারেন। আমি তো তাঁকে দেখিনি, কেমন করে জানব তাঁর কী রোগ ছিল ! যে-ডাক্তার দেখতেন ভদ্রলোককে, তিনি বলতে পারেন।"

কিকিরা বললেন, "সেটা আমরা খোঁজখবর করে জেনে নেব। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, ধরণীবাবুর মারা-যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়—এটা বলার কারণ কী ? তাও আবার চালাকি করে কাগজে ছাপানোর ব্যবস্থা করা। এটা যদি শেখরই করে থাকে, কেন করেছে ? শুধুমাত্র ধাপ্পা দিয়ে ব্ল্যাকমেল করা ? আর মহিমচন্দ্রই বা ভয় পেয়ে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন কেন ?"

তারাপদ হেসে হিন্দি করে বলল, "ডালমে কুছ্ কালা হ্যায়।"

চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করল, "শেখরটা কে কিকিরা ?"

"ধরণীমোহনের ছোট ভাগ্নে।"

"ভাগ্নে ! ছেলেটেলে নয় ?"

"না। ধরণীমোহন বিয়ে-থা করেননি। তাঁর সন্তান থাকার কথা নয়। দুই ভাগ্নে ছিল। বড় ভাগ্নে চা-বাগানে কাজকর্ম করে, ডুয়ার্সে। ছোট ভাগ্নে শেখর। সে নাকি বরাবরই বদ ধরনের ছেলে। মামাকে অনেক জ্বালিয়েছে। মামার কাছে থাকতও না আজকাল। আলাদা থাকত, সিঁথির দিকে। কী করত কেউ জানে না।"

"এখন সে কোথায় থাকে ?"

"মহিমচন্দ্র তা বলতে পারলেন না। বললেন, খোঁজ করে বলতে হবে।"

"মহিমচন্দ্রের বয়স কত ?"

"প্রায় পঞ্চাশ-টঞ্চাশ।"

"শেখরের ?"

"তিরিশ-বত্রিশ শুনলাম। মহিম বললেন।"

"ধরণীমোহনের বয়স কত ছিল ?"

কিকিরা সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খেয়াল হওয়ার পর বললেন, "মহিমচন্দ্রের চেয়ে বড় ছিলেন। উনি যখন মারা যান, তখন ওঁর বয়স আটান্ন-উনষাট।"

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কিকিরাকে আমি বলছিলাম, মহিমচন্দ্র

ছেলেমানুষ নন, বোকাও নন, তিনি ব্যবসাদার মানুষ। শেখর তাঁকে ধাপ্পা মেরে এক বছর ধরে টাকা নিচ্ছে, আর ভদ্রলোক পুলিশের কাছে যেতে পারছেন না! কারণটা কী? নিশ্চয়ই তাঁর কোনও গোলমাল আছে ভেতরে। নয় কি?"

চন্দন বলল, "আমারও তাই মনে হয়।" বলে কিকিরার দিকে তাকাল। "আচ্ছা কিকিরা, শেখর নাহয় অন্য লোক মারফত টাকা নেয়। কিন্তু টাকা নেওয়ার আগে সে মহিমচন্দ্রের সঙ্গে

যোগাযোগ করে কেমন করে ?"

"ফোনে।"

"ফোনে ! কোত্থেকে ফোন করে ?"

"যে-কোনও জায়গা থেকে। ফোন করার অসুবিধে কোথায় ? পাবলিক ফোন আছে, দোকান আছে।"

"নিজের নাম বলে ?"

"বলে।"

"কোথায় টাকা দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, তাও বলে ?"

"বলে। একই লোককে একবারের বেশি দু'বার টাকা নিতে পাঠায় না।"

"যে টাকা নিতে আসে, তাকে মহিমচন্দ্র চেনেন কেমন করে ? শেখর কি কোনও চিঠি লিখে দেয় ?"

"তুমি পাগল হয়েছ ! চিঠি লিখে দেবে ! শেখর একটা সাঁটের কথা, মানে চিহ্নের কথা বলে দেয়। যেমন হয়তো বলল, যে নিতে যাবে তার চোখের চশমার ফ্রেমটা হবে সোনালি, বা হয়তো বলল, অমুক লোকটার পকেটের রুমাল হবে খয়েরি, গলায় কালো টাই থাকবে, এইরকম আর কি !"

তারাপদ বলল, "এত জেনেও মহিমচন্দ্র পুলিশকে খবর দিচ্ছেন না ! মানে, তিনি পুলিশ ডেকে ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভয় পাচ্ছেন ! তাঁর এই ভয় দেখেই মনে হয়, ভদ্রলোক কোনও গুরুতর ব্যাপার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। পাপকর্ম করলে তো ভয় থাকবেই।"

কিকিরা বললেন, "সেটা খুব স্বাভাবিক। মহিমবাবুকে সন্দেহ হতেই পারে। কিন্তু তারাপদ, আমি বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক যদি পাপকর্ম করেই থাকবেন তবে আমার কাছে আসবেন কেন ? ক্রিমিন্যালরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে উকিল ধরে। উকিল সব

জেনেশুনেও তার মক্কেলকে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আমি তো বাবা পুলিশ কোর্টে ক্রিমিন্যালদের হয়ে ওকালতি করি না ! আমার কাছে কেন !"

তারাপদ বা চন্দন কেউই সেটা বুঝতে পারছিল না। মহিমচন্দ্র শেখরকে টাকা দিচ্ছেন বারবার, অথচ পুলিশকে জানাচ্ছেন না। আবার তিনিই এসেছেন কিকিরার কাছে সাহায্য চাইতে। অদ্ভুত ব্যাপার !

কিকিরা এবার উঠে পড়লেন দু' হাত মাথার ওপর তুলে, দু' পাশে ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। ক্লান্তি লাগছিল বোধ হয়। হাই তুললেন। তারপর বললেন, "এখন থাক। পরে ডাকব। দাও, একটা ফুঁ দাও তোমাদের।"

'ফুঁ' মানে সিগারেট। চন্দন সিগারেট দিল।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, আপনি বলেছিলেন—দু-এক হপ্তার মধ্যে বেড়াতে বেরোবেন। বিষ্ণুপুর যাবেন ! কী হল ?"

"গেলেই হয়। চাঁদু দিন ঠিক করুক।"

"আমি ঠিক করছি," তারাপদ বলল, "এপ্রিলের গোড়ায় চলুন। না হয় মার্চের কুড়ি-বাইশ..."

কিকিরা বললেন, "মন্দ নয়। তার আগে একবার পালিত লেন-এ যেতে হবে।"

"পালিত লেন ? সেটা কোথায় ?"

'আনন্দ পালিত নয়, এ হল হেম পালিত। শিয়ালদার দিকে।"

"সেখানে কী ?"

"মহিমচন্দ্রের বাড়ি। তিনি আমায় যেতে বলে গিয়েছেন।"

"ও !...তার মানে, আপনি এখন মহিম নিয়ে ফেঁসে গেলেন ! বিষ্ণুপুর হচ্ছে না ?"

"কেন হবে না! মহিম-কেসটা যদি মিটে যায় হে, প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে যাব।"

"আচ্ছা! কত টাকা দেবেন মহিম?"

"সে কাজের খাটুনি বুঝে। তা পাঁচ-সাত হাজারের কম তো নয়।"

তারাপদ উঠে পড়ল। ইশারা করল চন্দনকে। অর্থাৎ, নে উঠে পড়, আর নয়।

কিকিরা মানুষটি বিচিত্র। তিনি যে লাখ টাকার মালিক তা নন। সামান্য টাকাপয়সা তাঁর আছে ব্যাঙ্কে। তা বলে এত পয়সা নেই যে, পায়ের ওপর পা তুলে বছরের পর বছর কাটাতে পারেন। যারা তাঁর কাছে আসে, সাহায্য চায়—তাদের কাছ থেকে তিনি অনায়াসেই দশ-বারো হাজার নিতে পারেন। কিন্তু নেন না। যে যা দিল, তাতেই খুশি। ফলে দু-চার হাজারের বেশি আয় হয় না। অথচ টাকা কিকিরার দরকার।

চন্দনও উঠে পড়েছিল।

তারাপদ বলল, "শুনুন কিকিরা, একটা সাফ কথা বলে দিচ্ছি! মহিমচন্দ্র একজন ব্ল্যাকমেলারকে বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে দিচ্ছেন। আপনাকে যদি তিনি পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স না করেন—আমরা এতে নেই।"

কিকিরা বললেন, "ওহে তারাবাবু, আমি ব্ল্যাক নই, হোয়াইট। পাঁচ কেন হে, পনেরোও নিতে পারি, তবে কাজ বুঝে। আগে কাজটা দেখি—তবে না টাকাপয়সার কথা!"

"তা হলে আপনি কাজ বুঝুন। আমরা চলি।"

"তা যাও। তবে কাল এখানে তুমি চলে আসবে, বিকেল-বিকেল আমরা পালিত লেন-এ যাব।"

তারাপদ কিছু বলল না।

পালিত লেনকে ঠিক গলি বলা যায় না। রাস্তা খানিকটা চওড়া। তবে বেশিরভাগ ঘরবাড়ি সেই আদ্যিকালের। কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই। ওরই মধ্যে দু-চারটে বাড়ি পুরনো হলেও পরে তার রকমফের হয়েছে। অন্যরকম দেখায় খানিকটা।

মহিমচন্দ্রদের বাড়িটা কিন্তু গলির মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতন। প্রথমে ধরা যায় না, দু-চার পা এগিয়ে গেলে বোঝা যায়, গলির গা ছুঁয়ে আট-দশ গজ প্যাসেজ। ফটকের মতন খানিকটা জায়গা; ভেতরের দিকে সামান্য ফাঁকা জমি। তার গায়ে বাড়ি। ফটক থেকে বিশ-পঁচিশ পা এগুলে দোতলা বাড়িটা চোখে পড়ে। পুরনো বাড়ি, কিন্তু সামনের দিকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। রঙচঙ করা, হাল ফ্যাশানের গ্রিল, বাহারি ব্যালকনি। সামনের জমিতে অল্পস্বল্প বাগান, গাড়ি রাখার গ্যারাজ।

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার মক্কেল ধনী লোক। বাড়ির চেহারা দেখছেন না!"

কিকিরা বললেন, "রঙ কারখানার মালিক, গরিব হবে কোন দুঃখে!"

"তা হলে অ্যাডভান্সটা আজই চেয়ে নেবেন। নগদ।"

"তুমি তো বেশ মানি-ক্যাচার হয়ে পড়েছ?"

হেসে ফেলল তারাপদ। বলল, "মানি-ক্যাচার কী জিনিস, কিকিরা?"

“মানি ক্যাচিং যারা করে তারাই মানি-ক্যাচার। আগেকার রেল এঞ্জিনে কাউ-ক্যাচার থাকত, দেখেছ?”

“মনে করতে পারছি না, স্যার।”

“থাক, মনে করতে হবে না। ওই লোকটাকে ডাকো, বলো—মহিমচন্দ্রকে খবর দিতে।”

বারান্দার সিঁড়ির কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিকিরাদের দেখছিল। তারাপদ তাকে ডাকল।

লোকটা কাছে এলে তারাপদ বলল, “মহিমবাবুকে খবর দাও, বলো রায়বাবু এসেছেন। তাঁর আসার কথা ছিল।”

লোকটা দেখল কিকিরাকে, তারপর চলে গেল।

এখনও আলো আছে। বিকেল পড়ে যাওয়ার পরও এ-সময় আজকাল আলো থাকে। যদিও ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল, তবু গরম পড়ে আসছে।

কিকিরা বললেন, “মহিমচন্দ্র বাড়িতেই। গাড়ি রয়েছে দেখছি।”

তারাপদ বলল, “স্যার, আপনি কি একটা জিনিস নজর করেছেন?”

“কী?”

“এই বাড়ির দু-চারটে বাড়ি আগে একটা ফার্নিচার পালিশের ছোট দোকান দেখলাম। দোকানের বাইরে একটা ছেলে স্কুটার দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের দেখছিল।”

কিকিরা বললেন, “দেখছিল তো কী হয়েছে! দেখতেই পারে। আমরাও তো রাস্তার লোক দেখি।”

“দেখা আর নজর করা এক জিনিস নয়। আমরা এ-বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত ও নজর করেছে।”

কিকিরা কিছু বললেন না।

তারাপদ বলল, "চাঁদু কাল বলছিল, মহিম লোকটাই প্যাঁচালো। ওর কোনও মোটিভ আছে।"

"থাকতে পারে। খানিকটা না এগিয়ে কিছু বলা যাবে না।"

ততক্ষণে সেই লোকটা বাড়ির ভেতর থেকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে রীতিমত খাতির করেই কিকিরাদের ডাকল। "আসুন— বসবেন চলুন। বাবু আসছেন।"

নিচেই একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কিকিরাদের বসাল লোকটা। ঘরের আলো জ্বেলে দিল। দরকার ছিল না, তবু জ্বালল। পাখাটাও চালিয়ে দিল। ধীরেই চলছিল পাখা।

এটা যে মহিমচন্দ্রের বসার ঘর— বৈঠকখানা, বোঝা যায়। সেইভাবেই সাজানো। সোফা-সেটির সঙ্গে একটা ডিভানও আছে। বাড়তি কিছু চেয়ার। ঘরের দেওয়াল-আলমারিতে নানারকম সাজাবার জিনিস। দেওয়ালে দু-চারটে ছোট-বড় ছবি। বড় করে বাঁধানো একটা ফোটোও ছিল। মহিমচন্দ্রের বাবারই বোধ হয়। কিকিরা ঘরটা দেখছিলেন। তারাপদও দেখছিল, তবে সে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মহিমচন্দ্র এলেন।

ঘরে ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারাপদকে দেখলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি ফিরে এসেছেন! ভাবছিলাম, কী জানি আপনি হয়তো কারখানা থেকে এখনও ফেরেননি!" বলে একটু হাসলেন কিকিরা, তারাপদকে দেখালেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হল তারাপদ জুনিয়ার। আমার শাগরেদ। আমার মশাই দুই জুনিয়ার শাগরেদ, একজনকে নিয়ে এলাম। আরেকজন হল ডাক্তার। চন্দন। তাকে আজ আনা হল না। পরে আপনার সঙ্গে চন্দনের আলাপ হবে।"

মহিমচন্দ্র ইতস্তত করে বললেন, "আপনার শাগরেদদের কথা জানতাম না। আগে কিছু বলেননি !"

কিকিরা হালকা ভাবেই বললেন, "কাল আপনি আর কিছুক্ষণ থাকলেই তারাপদকে দেখতে পেতেন। চন্দন অবশ্য অনেক পরে এসেছিল।"

এগিয়ে এসে মহিমচন্দ্র বসলেন, "এঁরা তবে আপনার লোক ?"

"হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে কাজ করি। একা সবদিকে চোখ রাখা যায় না।... আপনি আমার সামনে যা বলতে পারেন, এদের কাছেও তা বিশ্বাস করে বলতে পারেন।"

"ও ! কিন্তু...."

"কিন্তুর কিছু নেই, মহিমবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তা ছাড়া কালই আমি এদের কাছে আপনার কথা বলেছি।"

"বলে ফেলেছেন ?"

কিকিরা মাথা হেলালেন। না বললে কাজ করব কেমন করে ? আপনার যদি আপত্তি থাকে, তা হলে আমার পক্ষে—"

"না, না, তা নয়। আমি তো আপনার সাহায্য চেয়েছি।"

"তা হলে নির্ভাবনায় থাকুন।"

মহিমচন্দ্র গলা তুলে ডাকলেন, "অনাদি, অনাদি।"

সেই লোকটি আবার এল।

অনাদিকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন মহিমচন্দ্র। অনাদি চলে গেল।

কিকিরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "মহিমবাবু, কাল তো সব কথা হয়নি। সময় হয়ে ওঠেনি। আপনার ব্যাপারটাই ভাবছিলাম কাল। আরও কিছু কথা যে জানা দরকার।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "বলুন, কী জানতে চান ?"

"আপাতত দু-একটা কথা বলুন। ধরণীমোহনের একটা অংশ

তো আপনাদের রাহা ব্রাদার্সে আছে। নয় কী ?"

"আছে। আমার দাদা অহীনচন্দ্র যখন রঙ কারখানা শুরু করেন—তখন নিজেদের টাকাতেই করেছিলেন। বছর কয়েক পরে মেজোবাবু—মানে ধরণীদা আসেন। তাঁর টাকাপয়সা ছিল না। কিন্তু মাথা ছিল। অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন। দাদার বন্ধু ধরণীদা। দাদা ওঁকে কোম্পানিতে নিয়ে নেন। ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে। পরে তাকে অংশীদারও করে দেন কোম্পানির।"

"সমান-সমান ?"

"না। প্রথমে আমাদের বারো, ওঁর চার। পরে ওটা দশ-ছয় হয়। মানে ছয় ভাগের অংশীদার।"

"ধরণীবাবু লাভের অংশ পেতেন ?"

"বরাবর। এই টাকা থেকে মেজোবাবু ছোট একটা ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন বেলগাছিয়ার দিকে।"

"সেখানে কে-কে থাকত ?"

"এখন কেউ থাকত না। একা মেজোবাবু থাকতেন। তবে ফ্ল্যাট তো হালে কিনেছেন, বছর তিন-চার আগে। এর আগে ভাড়াবাড়িতে থাকার সময় এককালে সবাই থাকত, মেজোবাবু, মানুপিসি—মানে মেজোবাবুর বিধবা দিদি, দুই ভাগ্নে।"

মহিমচন্দ্র পুরনো কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন। ধরণীমোহন একসময় বিধবা দিদি আর ভাগ্নেদের নিয়েই থাকতেন। মানুষও করেছেন ভাগ্নেদের—অন্তত আট-দশ বছর তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন শেষের দিকে। বড় ভাগ্নে ধীরাজ স্বভাবে ভাল, বুদ্ধিমান। সে কাজকর্ম করতে-করতে চা-বাগানে চাকরি জুটিয়ে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় মাকে। মা অবশ্য চা-বাগানেই মারা যান। আর শেখর বরাবরই অবাধ্য, বদমাশ ধরনের। মেজোবাবু তাঁর ছোট ভাগ্নেকে নানাভাবে শোধরাবার চেষ্টা করেন। এমন কি,

তাকে রঙ কারখানাতে এনে কাজকর্ম শেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বভাব মন্দ হলে যা হয়— শেখর কাজকর্ম তো শিখলোই না, কোম্পানির টাকা মেরে পালিয়ে গেল। মেজোবাবু তখন থেকেই ছোট ভাগ্নের মুখদর্শন করতেন না। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারাপদ ধরণীমোহনের বৃত্তান্ত শুনতে-শুনতে মহিমচন্দ্রকে দেখছিল। মামুলি চেহারা, গোলগাল, আধ-ফরসা, মাথার চুল ছোট-ছোট, কোঁকড়ানো, চোখে চশমা। ভদ্রলোককে দেখলে বোঝা যায় না— তিনি কোম্পানি চালানোর বুদ্ধি ধরেন। সাদামাঠা মনে হয়। তবে মুখ দেখে কি মানুষ চেনা যায়! মহিমচন্দ্রের চোখের মণির রঙ যেন খয়েরি, মাঝে-মাঝে চকচক করে ওঠে। ওইখানেই যা একটু অন্যরকম মনে হয়।

কিকিরা কথা বলছিলেন। বললেন, "শেখরের দাদার নাম কী বললেন যেন?"

"ধীরাজ।"

"বয়েস কত?"

"আমার চেয়ে অনেক ছোট। বছর আটত্রিশ।"

"শেখরের বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ হবে?"

"হ্যাঁ।"

"শেখর যে এভাবে আপনার কাছ থেকে টাকা নেয়, আপনি তার দাদাকে জানিয়েছেন?"

"মহিমচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বললেন, "না।"

"নয় কেন?"

কোনও জবাব যেন মুখে এল না মহিমচন্দ্রের। শেষে অবশ্য বললেন, "জানাইনি, কারণ দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আর নেই। সে তার ছোট ভাই সম্পর্কে কিছু জানতে চায় না। খোঁজখবরও রাখে না। মেজোবাবু যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,

তাকে সে ভাই বা আত্মীয় বলে মনে করে না।"

"ধরণীবাবুর ফ্ল্যাট, টাকাপয়সা, কোম্পানির লাভ থেকে পাওয়া অংশ, এসব কে পাবে? দুই ভাগ্নেই তো?"

"না," মাথা নাড়লেন মহিমচন্দ্র, শেখর কিছু পাবে না। মেজোবাবু সেটা লেখাপড়া করে গেছেন। ধীরাজ পাবে। ধীরাজ কলকাতার ফ্ল্যাট পাবে, আর বছরে কুড়ি হাজার টাকা। মেজোবাবুর পাওনা টাকা— যা কোম্পানি থেকে পাওয়া যাবে, তার থেকে কুড়ি হাজার টাকা মাত্র। আর বাকি টাকা দেওয়া হবে সীতাপুরের কুষ্ঠাশ্রমকে।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "কুষ্ঠাশ্রমকে?"

"হ্যাঁ। মেজোবাবু বরাবরই ওই আশ্রমকে টাকা দিতেন।"

অনাদি ট্রে সাজিয়ে চা আনল। চা আর মিষ্টি।

"নিন রায়মশাই, একটু চা খান।"

চা দিয়ে অনাদি চলে গেল।

চা খেতে-খেতে মহিমচন্দ্র নিজেই বললেন, "আপনি আমায় কাল বলছিলেন, আমি কেন পুলিশকে খবর দিচ্ছি না!... দেখুন, ওটা তো সহজ কাজ। ওই কাজটা আমি করতে পারছি না কেন— তা আমার পক্ষে আপনাকে বলা সম্ভব নয়। আগেই আমি সে-কথা বলেছি। কিছু মনে করবেন না রায়মশাই, সংসারে এমন জিনিস থাকে যা অন্যকে বলা যায় না। যদি বলতে পারতাম, আমি বেঁচে যেতাম। আপনার কাছেও ছুটতে হত না।... আপনি পারলে আমাকে শেখরের হাত থেকে বাঁচান। নয়তো, নয়তো..." কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মহিমচন্দ্র।

তারাপদর যেন মনে হল, মহিমচন্দ্র কোনও শক্ত জালে জড়িয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে আসার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তিনজনেই চা খেতে লাগলেন মুখ বুজে।

শেষে কিকিরা বললেন, "শেখরকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

"না। ও যে কোথায় থাকে, আমি জানি না।"

"তবু— ?"

"আমি তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি... তবে দু-তিনটে জায়গার কথা আমি বলতে পারি, সেখানে চেষ্টা করতে পারেন।"

"কোন-কোন জায়গা?"

"সিঁথির দিকে একটা বাড়িতে সে থাকত, সেখানে খোঁজ করতে পারেন। বাড়ির নম্বর আমি জানি না। শুনেছি, বাড়ির কাছাকাছি র‍্যাশন শপ আছে।"

"আর?"

"বউবাজারের মলঙ্গা লেন-এর আশেপাশে একটা সস্তা হোটেল আছে— সেখানেও সে থাকত।"

"আর?"

"হ্যারিসন রোডে ওকে দেখা গিয়েছে। চশমার দোকানে।"

"শেখর কি চশমা পরে?"

"হ্যাঁ। ওর চোখ বেশ খারাপ।"

"ওর একটা ফোটো আমাদের দেখাতে পারেন?"

"পারি।"

"আর-একটা কথা মহিমবাবু! ধরণীমোহন কীভাবে মারা যান? মানে, ঠিক কীভাবে?"

"সে তো আগেই বলেছি।"

"হার্ট ফেলিওর বলেছেন। কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেলিওর কেন?"

"তা বলতে পারব না। ডাক্তার যা বলেছেন, তাই জানি।"

"ডাক্তার কি ধরণীবাবুর নিজের ? ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার মুখার্জি। বিকাশ মুখার্জি।"

"ঠিকানা ?"

মহিমচন্দ্র ঠিকানা বলতে পারলেন না, জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন।

কিকিরা এবার উঠলেন। বললেন, "আজ চলি।.... ও, ভাল কথা, শেখরের একটা ফোটো যদি এনে দেন !"

"খুঁজে বের করতে হবে। কাল আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

"তাই দেবেন।"

ডাক্তার বিকাশ মুখার্জির বয়স হয়েছে। প্রবীণ মানুষ। তাঁর চেম্বার আর ডিসপেনসারি দেখলে মনে হবে, বেশ পুরনো। কোনও বাহার নেই। ম্যাড়মেড়ে। সাধারণ মানুষ, গরিব-গুরবোদেরই ভিড় বেশি সেখানে।

ডিসপেনসারিতেই শেষপর্যন্ত বিকাশ ডাক্তারকে ধরলেন কিকিরা। মিথ্যে একটা পরিচয় দিয়ে। উপায় ছিল না। তা হোক—তবু অনেকটা বেলায় ধরতে পারলেন। একাই এসেছেন কিকিরা। তারাপদ অফিসে, চন্দন তার হাসপাতালে।

ডাক্তারবাবু মানুষটি ভাল। তবে কথা বেশি বলেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

কিকিরা সবিনয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ধরণীমোহনের কথা তুলতেই বিকাশ ডাক্তার যেন মহাভারত খুলে বসলেন। হাজার কথা।

ধরণীমোহন কেমন বিশ্বাস করতেন তাঁর ডাক্তারকে, কতটা মান্য করতেন তাঁকে—এসব কথা দিয়ে শুরু করে ধরণীমোহনের পুরনো কথা, এমন কি, বেলগাছিয়ায় ফ্ল্যাট কেনার পেছনেও যে ডাক্তারের বারো আনা উদ্যোগ ছিল, তাও বুঝিয়ে দিলেন।

মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ডাক্তারবাবুর একতরফা বক্তৃতা শোনার পর কিকিরা বললেন, "উনি মারা গেলেন কীভাবে ?"

"হার্ট ফেল করে। সাম কাইন্ড অফ ব্লকিং ... মশাই, সে কী বলব আপনাকে। সেদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ ধরণীবাবুর বাড়ি থেকে লোক এল। কাজের লোক, জগন্নাথ। এসে বলল, বাবুর বুকে খুব কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছেন, আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। ... ব্যাগ আর কয়েকটা ইঞ্জেকশন হাতে ছুটলাম। এদিকে আবার সেদিন একটা মিনিবাস অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে হাঙ্গামা বেঁধে গিয়েছে... ছুটতে-ছুটতে গিয়ে দেখি, ধরণীবাবু বিছানায় ছটফট করছেন, বমি করেছেন, বুকে অসহ্য কষ্ট, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা, স্প্যাজ্‌ম হচ্ছে—। প্রেশার, হার্ট—সবই দেখলাম। একটা ইঞ্জেকশনও দিলাম। অক্সিজেনের জন্যে লোক পাঠালাম। ভাবলাম, এই মুহূর্তে হাসপাতালে পাঠাতে না পারলে তো পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে না। ... কিন্তু আমাদের অবস্থা বোঝেন। হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে করতে রোগী মারা গেলেন।"

"বাড়িতেই।"

"হ্যাঁ। আমার চোখের সামনে।"

কিকিরা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আরও কিছু কথা জানার আছে। কিন্তু তিনি তো আর পুলিশের লোক নন। প্রাইভেট কোনও গোয়েন্দা অফিসেরও অফিসার নন, কাজেই খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সাত-সতেরো প্রশ্ন করা যায় না। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করবেন। এমনিতেই তো তিনি প্রথমে কথা বলতে চাননি। কেন বলবেন ?

অজানা অচেনা একজন লোকের সঙ্গে নিজের মৃত এক রোগীর বিষয় নিয়ে কথা বলতে কোন ডাক্তারই বা চায় ! কিকিরা এসব জানতেন। কাজেই গোড়াতেই মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি একটা জমিজমা সংক্রান্ত কারবারের একজন কর্মচারী। ধরণীমোহনের কিছু জমি ছিল তাঁদের হাতে। তিনি মারা যাওয়ার পর সেই জমির ভাগীদার নিয়ে কোম্পানি খোঁজখবর করছে। তার আগে কিছু সাধারণ মামুলি কাগজ-কলমের কাজ থাকে। কিকিরা সেই কাজ সারতে ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছেন। রুটিন ওয়ার্ক বলতে যা বোঝায় এটাও তাই।

ডাক্তারবাবুর মেজাজ বুঝে কিকিরা এবার বললেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওঁর কোনও ভারী অসুখ ছিল ?"

"না। এই বয়েসে যা হয়, সামান্য হার্টের গোলমাল। নেগলিজেব্‌ল। তবে অ্যাজমা ছিল। বছরে দু-একবার করে পড়তেন বিছানায়। আর অসুখ বলতে ব্লাড সুগার বাড়ত মাঝে-মাঝে। বেশি বাড়ত না। খাবারদাবার ধরাকাটা করে সেটা ম্যানেজ করা যেত।"

"তবে তো ভয় পাওয়ার মতন ..."

"না, না, একেবারেই নয়। ... একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—ধরণীবাবুর দুটি বদ অভ্যাস ছিল। অকারণ আজেবাজে ওষুধ খেতেন। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আর মাথা ধরার ওষুধ তো মুড়ি-মুড়কির মতন খেতেন। দরকার নেই, তবু খেতেন। মনের বাতিক। কতবার বারণ করেছি—শুনতেন না। বলতেন, আরে এগুলো তো ইনোসেন্ট, এতে আর ক্ষতি কী হবে ! ... বুঝলেন মশাই, উনি যেদিন মারা যান, সেদিনও আমি এসে দেখি—ধরণীবাবুর মাথার কাছে অ্যান্টাসিডের পাতা। পাতা প্রায় শেষ। পর পর কত যে খেয়েছেন, ঠিক নেই।"

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। সুতো বেশি টানলে ছিঁড়ে যেতে পারে।

"ডাক্তারবাবু, এবার অন্য একটা কথা।"

"বলুন?"

"ধরণীবাবুর ওয়ারিশান বলতে দুই ভাগ্নে।"

"হ্যাঁ। ধীরাজ আর শেখর।"

"আপনি চেনেন?"

"চিনি। তবে কম। ধীরাজ চা-বাগানে থাকে। কলকাতায় কমই আসত। মামার কাজের সময় এসেছিল।"

"শেখর?"

"তাকে দেখেছি। কাজের সময়ও দেখেছি। ওই ছোকরা ভাল নয়। রাফিয়ান টাইপের। ভদ্রঘরের ছেলে হয়েও অতি অসভ্য, রুড। অপদার্থ ছেলে!"

"যদিও আমাদের জানার কথা নয়, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ধরণীবাবু কি ভাগ্নেদের সম্পর্কে কিছু বলতেন আপনাকে বন্ধু হিসেবে?"

"শেখরের নাম উচ্চারণ করতেন না বড়। ধীরাজকে ভালবাসতেন।"

কিকিরা এবার উঠতে-উঠতে বললেন, "শেখর থাকে কোথায়?"

"জানি না।"

"ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, চলি—! আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

মুখার্জি ডাক্তার মাথা হেলালেন, "নমস্কার।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "ভাল কথা, এতক্ষণ কথা বললাম, আপনাকে তো একটা জরুরি জিনিস

দেখানো হয়নি।" বলে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা পুরনো খবরের কাগজ বের করলেন। করে এগিয়ে দিলেন। "এই দাগ দেওয়া জায়গাটা একবার পড়ুন।"

ডাক্তার অবাক হয়েছিলেন। তবু কাগজটা নিয়ে পড়লেন দাগ-দেওয়া জায়গাটা। পড়া শেষ করে বললেন, "পড়লাম।"

"কিছু নজরে পড়ল?"

"না।"

"ওই যে লিখেছে, মৃত্যু-রহস্য, মানে হঠাৎ মারা যাওয়ার

পেছনে যে-রহস্য আছে, তার কোনও কিনারা করা যায়নি। দেখেছেন ?”

কাগজটা আবার দেখলেন মুখার্জি ডাক্তার। তারপর বললেন, “ননসেন্স। কোনও মানে হয় না। এসব বাজে কথা। শুনুন মশাই, একটা কথা পরিষ্কার বলি। ডাক্তার ভগবান নয়। অনেক লোকই হঠাৎ মারা যায়, অ্যাপারেন্ট কোনও রিজ্‌ন থাকে না। কেন মারা গেল, তা বলা যায় না। হাজার কারণ থাকতে পারে! যাক গে, এসব বাজে কথার কোনও মানে নেই। নিন আপনার

কাগজ।”

কিকিরা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন। নমস্কার জানিয়ে চলে এলেন ঘর ছেড়ে।

রাস্তায় নেমে কেমন যেন হতাশ লাগছিল তাঁর। ডাক্তারবাবু মানুষটি ভাল। তিনি যে কিছু লুকোবেন, তাও মনে হল না। ধরণীমোহনের ডেথ সার্টিফিকেট তিনিই দিয়েছেন। কোনওরকম সন্দেহ হলে কখনওই তিনি সার্টিফিকেট দিতেন না। মুখার্জি ডাক্তার এমন মানুষ যে, তাঁকে দিয়ে জোর করে বা টাকা খাইয়ে মিথ্যে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

তা হলে কেন ওই মৃত্যু রহস্যের কথা লেখা হয়েছে? কেন? কী উদ্দেশ্য নিয়ে? শুধুই কি মহিমচন্দ্রকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের জন্য! তাই বা হবে কেন? কোনও কারণ নেই, মিথ্যে একটা ধোঁকা দিয়ে টাকা আদায়! আর মহিমচন্দ্র সব জেনেশুনে, বুঝেও ধাপ্পাবাজের হাতে হাজার-হাজার টাকা গুঁজে দিচ্ছেন গত একটি বছর ধরে! আবার এ-কথাও বলছেন যে, কেন তিনি দিতে বাধ্য হচ্ছেন তা বলতে পারবেন না। মানে, তিনি কারণটা গোপন রাখতে চাইছেন! অদ্ভুত!

কিকিরা কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মহিমচন্দ্রের ওপরই তাঁর রাগ হচ্ছিল। ভদ্রলোক চান, সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না। বা রে মজা!

সন্ধের মুখে-মুখে তারাপদ আর চন্দন একই সঙ্গে এল। চন্দনকে তার মেডিকেল মেস থেকেই ধরে এনেছে তারাপদ। সেইরকমই কথা ছিল।

ঘরে পা দিয়েই তারাপদ বলল, “সার, মলঙ্গা লেনের আশেপাশে খোঁজখবর করে দুটো হোটেল পেলাম। দুটোই তিন

নম্বর ক্লাসের, চার নম্বরও বলতে পারেন। থার্ড ক্লাস! মামুলি। ওর মধ্যে একটা হোটেলে শেখরের খোঁজ পাওয়া গেল। ম্যানেজার আধ-বুড়ো, কানে কম শোনে, তবে ওস্তাদ লোক। প্রথমে মুখ খুলতে চায় না। অনেক ভজিয়ে-ভাজিয়ে, শেখরের খবর পেলাম। হোটেলের খাতার পাতা উলটে তার নামও বের করল ম্যানেজার। শেখর সপ্তাহ দুই আগেও ওই হোটেলে ছিল।"

কিকিরা বললেন, "মানে ক'দিন আগেও ছিল। পয়লা ফাল্গুনে যখন ওই শ্রদ্ধাঞ্জলি কাগজে বেরোয়, তখনও ছিল নাকি! আচ্ছা, শেখর কি ওই হোটেলে প্রথম আস্তানা গাড়ে?"

"না। ম্যানেজার বলল, পুরনো পার্টি। আর দু-একবার এসে থেকেছে।"

"হোটেলের খাতায় নিজের ঠিকানা কী দিত?"

"বালুরঘাট। বলত, বিজনেস করে, তাই মাঝে-মাঝে আসতে হয় কলকাতায়।"

"কিসের বিজনেস?"

"তা বলেনি।" বলে তারাপদ নিজের জায়গায় বসল। আবার বলল, "অফিস পালিয়ে সারা দুপুর আপনার কাজ করেছি, কিকিরা। কাল আমায় সেকশান-ইন-চার্জের দাবড়ানি খেতে হবে।"

কিকিরা কান দিলেন না কথাটায়। বললেন, "সিঁথি! সিঁথির খবরটার কী হল?"

"অফিসের এক বন্ধুকে বলেছি। হরিপদ। সিঁথিতেই থাকে, বেণী কলোনিতে। বলেছে খোঁজ এনে দেবে।"

"একটু তাড়াতাড়ি চাই হে, তারাপদ। দেরি করলে ক্যাচ করার অসুবিধে হবে।"

চন্দন বলল, "কেন ?"

কিকিরা বললেন, "কেন ? মহিমচন্দ্র যা বলছেন, তা যদি হয়—তবে দিন দশেক আগে শেখর শেষ টাকা নিয়েছে। পয়লা ফাল্গুনের আগে-আগেই। টাকাও নিয়েছে, আবার কাগজে শাসিয়ে রেখেছেও। এবারে নিয়েছে হাজার বারো। টাকা নেওয়ার পর মাস দেড়-দুই আর ও উৎপাত করে না। কাজেই শেখর আবার কবে টাকা চাইবে—তার জন্যে আমরা বসে থাকতে পারি না।"

চন্দন বলল, "কিন্তু একটা পাকাপাকি ঠিকানা ছাড়া শেখরকে পাবেন কেমন করে ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কথাটা ঠিকই। তবে, অজানা অচেনা মানুষকে খুঁজে বের করতে হলে তো এইভাবেই খোঁজ নিয়ে নিয়ে বের করতে হবে। বললেন, "কলেজ স্ট্রিটে কোন্ চশমার দোকানে তাকে দেখা গিয়েছিল ... !"

চন্দন বলল, "কিকিরা, কলেজ স্ট্রিটে কি একটা চশমার দোকান ? কোন্ দোকানে সে গিয়েছিল, কেমন করে ধরব ?"

"চেষ্টা করতে হবে।"

কথা ঘুরিয়ে চন্দন বলল, "আপনার প্রোগ্রেস কতদূর ?"

"ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। কথাবার্তাও হয়েছে।" বলে কিকিরা ডাক্তার মুখার্জির কাছে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার বিবরণ দিলেন।

চন্দন মন দিয়ে সব শুনল। ভাবছিল। পরে বলল, "ধরণীবাবুর তো দেখছি কমসম করেও অনেক রোগ ছিল : ব্লাড সুগার, হার্ট ..."

"মুখার্জি ডাক্তার বললেন, ওগুলো নেগলিজিব্‌ল। বয়েস হয়েছিল ভদ্রলোকের, সামান্য গোলমাল তো থাকবেই।"

"তা ঠিকই।"

"তবে যেটা ঝামেলা করত সেটা অ্যাজমা !"

"অত অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খেতেন কেন ? অ্যাসিডিটির রোগ ছিল। আলসার ..."

"তা কিছু বললেন না।"

"আর মাথা ধরার ওষুধ। সেটাই বা অত খেতেন কেন ?"

"বাতিক হয়তো।"

"পকেটে সবসময় ওষুধ থাকত ?"

"হ্যাঁ।"

"কী ট্যাবলেট, নাম জানতে চেয়েছিলেন ?"

"না। সেটা বাড়াবাড়ি হত।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা স্যার, ডাক্তার মুখার্জি বলেছেন—তিনি যখন রোগীকে দেখতে যান, তখনও বিছানার পাশে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের পাতা ছড়ানো ছিল।"

"তাই বলেছেন। দেদার ট্যাবলেটও খেয়ে ফেলেছিলেন ধরণীমোহন। হয়তো, বুকের ব্যথা ওঠায় ভেবেছিলেন গ্যাসের জন্যে ব্যথা হচ্ছে।"

চন্দন কী ভেবে বলল, "আপনি কি ডাক্তার মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি ওঁর কাছে যাওয়ার পর ধরণীমোহন শুধু বুকের কষ্টের কথা বলেছিলেন, না—এমন কিছু বলেছিলেন যাতে মনে হয়, কোনও ওষুধ-বিষুধ খেয়ে হঠাৎ তাঁর এই কষ্ট হতে শুরু করেছে ?"

কিকিরা তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, তিনি জিজ্ঞেস করেননি। তাঁর মাথাতেই আসেনি।"

"তুমি হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন ?" কিকিরা বললেন।

"বলছি এইজন্যে যে, যদি কেউ তাঁকে এমন কোনও ট্যাবলেট খাইয়ে থাকে যেটা তাঁর পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর ! এ কেস অব

পয়জনিংও তো হতে পারে।”

কিকিরা শুনলেন। ভাবলেন। তারপর বললেন, “তা কেমন করে হবে! কে পয়জনিং করবে! তা ব্যাপারটা জানা কঠিন নয়। ওটা অবশ্য ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বা একবার গিয়ে দেখা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।”

তারাপদ বলল, “স্যার, পয়জনিং! আরেব্বাস! এ তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার! কে করবে পয়জনিং? কেন করবে? মহিমচন্দ্র কি এটা জানেন, বা অনুমান করেন?”

কিকিরা বললেন, “দাঁড়াও, অত হুড়োহুড়ি করে একটা ধারণা করে ফেলে লাভ নেই। মহিমবাবুর সঙ্গে আমরা কথা বলব! ধরণীবাবু মারা গিয়েছেন বাড়িতে। কারখানার অফিসে নয়। কাজেই মহিমকে ঝট করে চেপে ধরার অসুবিধে আছে। ধীরে-ধীরে জট খুলতে হবে।”

তারাপদ আর কিছু বলল না।

বগলা চা দিয়ে গেল।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, “তারাপদ, আমার মনে হয়—মহিমচন্দ্রদের, মানে রাহা ব্রাদার্সের রঙ কারখানায় একবার যাওয়া উচিত। সেখানে কিছু খোঁজখবর পাওয়া যেতে পারে। ধরণীমোহনের মারা যাওয়ার দিন সেখানে কিছু ঘটেছিল কি না, বা ওই কারখানায় মাঝেমধ্যে কোনও ঘটনা ঘটত কি না, খোঁজ নেওয়া দরকার। আর দরকার শেখরকে ক্যাচ করা।”

“প্রথমটায় ঝঞ্ঝাট নেই, স্যার, দ্বিতীয়টায় আছে।”

“থাকবে না।”

“থাকবে না! কেমন করে?”

“একটা মতলব ভাবছি। নট ইয়েট ফাইনাল। পরে বলব!”

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “স্যার, আপনার খেলার এখন কোন্

রাউন্ড চলছে ? সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন তো ! তারপর না ফাইনাল !" বলে হাসতে লাগল ।

রাহা ব্রাদার্সের রঙ কারখানা ছোটই । তবে তুচ্ছ করার মতন নয় । এখানে চায়না ব্ল্যাক, প্রিমিয়ার, সাদা রঙ—চলতি কথায় যা বলা হয়—সবই তৈরি হয় । সাদা, সবুজ, লাল, কালো—এই সব রঙ তৈরি হয় আর প্যাকিং হয়ে যায় । কারখানা ছোট হলেও একটা শৃঙ্খলতা আছে । কর্মচারী বেশি নেই ।

রঙের কিছুই বোঝেন না কিকিরা । তারাপদও নয় । তবু বিকেলে কারখানাটা একবার দেখে কিকিরা মহিমচন্দ্রের ঘরে এলেন । তারাপদ থাকল বাইরে । কিকিরা বলেছেন, কর্মচারীদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে যদি কোনও খবর জোটাতে পারে সে ।

মহিমচন্দ্র বললেন, "আসুন । কারখানা দেখা হল ?"

মহিমের সামনের চেয়ারে বসতে-বসতে কিকিরা খুশির গলায় বললেন, "মশাই, একটা কথা আছে জানেন তো ? এক ফোঁটা মধু, এক কলসি গুড়ের জলের চেয়ে ভাল । আপনাদের কারখানা দেখে তাই মনে হল । কাজ অল্প, কিন্তু রঙটঙ ভাল । হাই ক্লাস । পরিবেশটাও নোংরা নয় ।"

মহিমচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, "এটাই আমাদের বিজনেস মটো । যা করব যত্ন করে করব । অনেক বড় কোম্পানিও আমাদের জিনিস কেনে । কিনে নিজেদের নামে চালায় ।"

"কেন কিনবে না ! ... ভাল জিনিস পেলে কেউ ছাড়ে !"

"চা খাবেন ? না কোল্ড ড্রিংকস ?"

"চা।"

মহিমচন্দ্র ঘণ্টি বাজিয়ে কাকে ডাকলেন। "চা নিয়ে এসো। ভাল করে আনবে। ... আপনার শাগরেদটি কোথায় ?"

"বাইরে ঘুরছে। আসবে এখুনি ... ।"

মহিমচন্দ্র কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কিকিরা বললেন, "এটা আপনার অফিস ?" বলতে-বলতে ঘরটা দেখতে লাগলেন। একটা ঘর পার্টিশান করে দুটো ঘর করা হয়েছে। কাঠের পার্টিশান। চার ফুট মতন উঁচু, মাথায় ফুটখানেক কাচ। জানলা মাত্র দুটি। মহিমচন্দ্রের অফিসঘরটি সাধারণ ভাবেই সাজানো। লোহার আলমারি, ফাইল র‍্যাক, খুচরো কাগজপত্রর স্তূপ। দু-চারটে রঙের টিন। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ক্যালেন্ডার। বাঁধানো দুটি ছবি—মহিমচন্দ্রের বাবার আর দাদার।

কাঠের পার্টিশানের একটি জায়গায় ফাঁক। টিকিটঘরের কাউন্টারের মতন। পাশেই মহিমচন্দ্রের টেবিল। টেবিলের ওপর টেলিফোন, ফাঁকা জায়গাটির পাশেই।

কিকিরা ধীরেসুস্থে নিজের চুরুট ধরালেন। বললেন, "আপনার পাশের ঘরটা কি ধরণীবাবুর অফিসঘর ছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানেই উনি বরাবর বসতেন বোধ হয় !"

"বরাবর। আর এই যে ঘর, অফিস, চেয়ার, এখানে আমার দাদা বসতেন।"

"আপনি ?"

"আমি তখন বেশিরভাগ সময় আমাদের স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে বসতাম। পার্টি আর জিনিসপত্র সাপ্লাই নিয়ে থাকতাম।"

"এখন ওখানে কে বসে ?"

"আমাদের এক কর্মচারী, তবে আত্মীয়।"

"আত্মীয় ! কেমন আত্মীয় ?"

"দাদার শ্যালক। কান্তিলাল।"

দু-তিনটে ছোট-ছোট টান মারলেন কিকিরা চুরুটে। তারপর বললেন, "আচ্ছা, মহিমবাবু, আপনার আর ধরণীবাবুর অফিসের মধ্যে কাঠের পার্টিশান। আপনারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন কেমন করে ?"

মহিমচন্দ্র হাসলেন, "একটু জোরে কথা বললেই শোনা যায়, পাঁচ ফুট, সাড়ে পাঁচ ফুটের পার্টিশানে কী কথা আটকায় ! মাথার ওপর ফাঁকা। অবশ্য জরুরি কথা বলতে হলে ওঁর ঘরে যেতাম। উনিও আসতেন।"

"তা ঠিক। ... ফোনও তো একটা দেখছি।"

"একটাতেই কাজ হয়ে যায়। পার্টিশানের এ-পারে ও-পারে আমাদের টেবিল। ফোনটা এখন আমার টেবিলে, ওটা ওই ফোকর দিয়ে ওঁর টেবিলে ঠেলে দিতাম দরকারে। উনিও দিতেন। অসুবিধে কিছু হচ্ছিল না। এ-অফিসে দুটো ফোন। একটা কারখানার স্টোর রুমে রাখতে হয়। আর কত ফোন রাখবে কোম্পানি ?"

"তা ঠিক। তারপর আজকাল যা ফোনের হাল ! ... ইয়ে, আপনারা তা হলে যে যার ঘরে বসেই কথাবার্তা বলতে পারতেন।"

"হ্যাঁ। জরুরি কথা হলে ঘরে যেতাম।"

মহিমচন্দ্রের বেয়ারা চা নিয়ে এল। তিন কাপ। তারাপদ কিন্তু তখনও আসেনি।

"আপনার শাগরেদকে ডেকে পাঠাই ?"

"পাঠান।" কিকিরা চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, "একটা কথা বলুন তো মহিমবাবু, সেদিন কি এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল যাতে ধরণীবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ?"

মহিমচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন কিকিরার দিকে। পরে বললেন, "কেন, আপনাকে আগে বলিনি ?"

"না। মনে পড়ছে না।"

"বলেছি। আপনার খেয়াল নেই। বা হয়তো আমারই ভুল হয়েছিল বলতে।" মহিমচন্দ্র বললেন, "দুপুরে একটা ফোন এসেছিল মেজোবাবুর। ওপাশে তিনি ফোন ধরেছিলেন, কী কথা হয়েছিল আমি বলতে পারব না। তবে মেজোবাবু যেরকম জোরে জোরে কথা বলছিলেন, তাতে বুঝলাম তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছেন। গালিগালাজও করছিলেন।"

"কাকে করছিলেন আপনি জানেন না ?"

ইতস্তত করলেন মহিমচন্দ্র। শেষে বললেন, "মনে হল শেখরকে।"

তারাপদ এল। বসল একপাশে। কিকিরা ইশারায় চায়ের কাপ দেখালেন। মানে, নাও, চা খাও।

সামান্য পরে কিকিরা বললেন, "পরে আপনি নিশ্চয় ধরণীবাবুর ঘরে যান। তাঁকে দেখতে।"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"খুব উত্তেজিত দেখলেন ?"

"ভীষণ উত্তেজিত। মেজোবাবু বরাবরই একটু রগচটা, তবে সেদিন যেন রাগে ফেটে পড়ছিলেন।"

"আপনাকে কিছু বলেননি ?"

"না। শুধু বলছিলেন, এত সাহস ওর, আমাকে ধমকায় ! লোফার, রাস্‌কেল...।"

“কাকে বলছিলেন ?”

“জানি না। ... নাম বলেননি।”

“উনি কি অসুস্থ বোধ করছিলেন তখন ?”

“খানিকটা তাই। মেজোবাবুর পকেটে, ড্রয়ারে সবসময় ওষুধ থাকে। এই মাথা ধরছে, এই অ্যাসিডিটি হচ্ছে। যখন-তখন ওষুধ খান।”

“আপনি ওঁকে ওষুধ খেতে দেখলেন ?”

“হ্যাঁ। একটা ওষুধ আবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আনতে দেওয়া হল।”

“তারপর ?”

“আমি মেজোবাবুকে বাড়ি যেতে বললাম। শরীর খারাপ লাগছে, অযথা বসে থেকে কী লাভ !”

“উনি চলে গেলেন ?”

“ওষুধটা এল। উনি একটা ট্যাবলেট খেলেন। তারপরও বসে থাকলেন খানিকক্ষণ। শেষে আমি জোরাজুরি করতে উঠে পড়লেন। চলে গেলেন।”

“কিসে ?”

“ভ্যানগাড়িতে। আমাদের কোম্পানির একটা ভ্যানগাড়ি আছে। ডেলিভারির কাজে লাগে। ওই গাড়িতেই মেজোবাবু চলে গেলেন।”

“আপনার তো নিজের গাড়ি আছে। মেজোবাবুকে পৌঁছে দিতে গেলেন না কেন ?”

“যেতে চেয়েছিলাম। উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। জেদি মানুষ। বললেন, স্ট্র্যান্ড রোডের দোকান হয়ে বাড়ি যাবেন।”

কিকিরা সামান্য চুপ করে থাকলেন। চা শেষ হয়েছে। তারাপদও শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দিল।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করার পর কিকিরা বললেন, "ধরণীবাবু কি বাসে, ট্যাক্সিতে কারখানায় আসতেন ?"

"না, বর্ধনবাবুর গাড়িতে। দু-পাঁচদিন বর্ধনবাবুর গাড়ি আমরা পাচ্ছিলাম না। গাড়ির কাজ হচ্ছিল বলে অন্য গাড়ি ভাড়া নিতাম।"

"কার গাড়ি ?"

"এক হিন্দুস্থানির।"

"চেনেন তাকে ?"

"না, মুখে চিনি, এদিকেই ভাড়া খাটে। সেদিন তখন গাড়িটা ছিল না।"

কিকিরা এবার ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উঠতে উঠতে বললেন, "মেজোবাবুর খবর আপনি কখন পান ?"

"সন্ধেবেলায়।"

"তাঁর বাড়ি গিয়ে কী দেখেন ?"

"মেজোবাবু মারা গিয়েছেন।"

কিকিরা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। পরে বললেন, "আজ চলি মহিমবাবু। ... কাল-পরশু একবার আসুন না আমার কাছে।"

"যাব। আমি মশাই বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছি।"

"অকারণ নার্ভাস হচ্ছেন কেন! দেখুন না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। ... ভাল কথা, কাগজে আমিও একটা বিজ্ঞাপন ছাপছি। আপনার নামে নয়। তবে ব্যাপারটা আপনাদের।"

মহিমচন্দ্র যেন আঁতকে উঠলেন। "আবার বিজ্ঞাপন !"

কিকিরা হেসে বললেন, "উপায় কী! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলে একটা কথা আছে না! এ হল সেই প্রসেস।"

তারাপদও উঠে পড়েছিল।

কিকিরারা ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মহিমচন্দ্র বললেন, "একটু পরে আমিও তো উঠব। একসঙ্গেই যাওয়া যেত আমার গাড়িতে।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। হেসে বললেন, "আজ নয় স্যার, অন্য একদিন যাব। আজ একটু কাজ আছে।"

কারখানার বাইরে এসে কিকিরা বললেন, "কী হে, সমাচার কী?"

তারাপদ বলল, "খুব বেশি কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। তবে দুটো জবর খবর পেয়েছি।"

"কেমন?"

"এই কারখানায় শেখরের দু-তিনজন ইয়ার দোস্ত আছে।"

"কে-কে?"

"একজন ড্রাইভার। ছোকরা। ভাল নাম জটিলেশ্বর। জটা বলে ডাকে সবাই। জটার বাড়ি বউবাজার।"

"অন্য দু'জন?"

"কালী ঘটক। সে কারখানায় কাজ করে। থাকে বড়বাজারে।"

"তিন নম্বর?"

"ফণীশ্বর। ফণী বলে ডাকে লোকে। সে কিছুই করে না। নামে ইনচার্জ।"

কিকিরা বললেন, "এদের সঙ্গে শেখরের মেলামেশা হল কবে?"

"শেখর যখন এখানে কাজ করতে এসেছিল, তখন।"

কিকিরার মনে পড়ল, একসময় ধরণীমোহন তাঁর ছোট ভাগ্নেকে রঙ কারখানায় নিয়ে এসেছিলেন কাজকর্ম শেখার জন্য। কিন্তু সে কিছুই শেখেনি, শিখতে চায়নি। টাকা চুরি করে পালিয়ে

গিয়েছিল।

তারাপদ বলল, "স্যার, একটা জিনিস লক্ষ করলাম। এই কারখানায় শেখরের দু-একজন হেভি সাপোর্টার আছে। মেজোবাবুর অ্যান্টি পার্টি। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও বোঝা যায় তারা ধরণীবাবুর ওপর খুশি ছিল না।"

"কেন?"

"মেজোবাবু কড়া লোক ছিলেন। কাজের গোলমাল দেখলে গালমন্দ করতেন। চুরিচামারি ধরতে পারলে চোরের বারোটা বেজে যেত।"

"এরকম চোর কে?"

"একজনের কথা তো শুনলাম, জটা। জটিলেশ্বর।"

"তার কোনও শাস্তি হয়েছিল?"

"চাকরি চলে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে হাতেপায়ে ধরে চাকরিটা বজায় রেখেছে।"

"মহিমচন্দ্র সম্পর্কে কী শুনলে?"

"কাজকর্মে পাকা নয়, তবে মানিয়ে নেন সকলের সঙ্গে।"

কিকিরা অনেকটা হেঁটে এসেছিলেন। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন রাস্তার মোড়ে। ট্যাক্সিটা ধরতে বললেন তারাপদকে।

ট্যাক্সিতে উঠে কিকিরা বললেন, "কলকাতা। ধর্মতলা।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

তারাপদ সিগারেট দিল।

সিগারেট ধরিয়ে কিকিরা বললেন, "তারা, শেখরকে আমাদের পাওয়া চাই।"

"কেমন করে?"

"চেষ্টা করলে একটা লোককে ধরতে পারব না, তা কী হয়!

নিশ্চয়ই পারব। তুমি যাদের কথা বললে—তারা কেউ-না-কেউ শেখরের খোঁজ দিতে পারে। কিন্তু এখন আমি সে-পথে যাব না। অন্য পথে তাকে টোপ গেলাব।"

"কেমন টোপ ?"

"সম্পত্তির টোপ !"

"সম্পত্তির টোপ ! কোথায় পাবেন সম্পত্তি ?"

"সম্পত্তি পাব না। কিন্তু ডাক্তার মুখার্জিকে যেভাবে বাগিয়েছিলাম, শেখরকেও সেইভাবে বাগাতে চাই। দেখি কাজ হয় কি না !"

তারাপদ ভরসা পেল না, তবু বলল, "দেখুন !"

মহিমচন্দ্র যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। রায়মশাই এ কী পাগলামি করেছেন ! বললেন, "এ আবার কী করেছেন ?"

কিকিরার ঘরে সন্ধেবেলায় চারজনই বসে আছেন : কিকিরা, মহিমচন্দ্র, তারাপদ আর চন্দন। চন্দনকে আজই প্রথম দেখলেন মহিমচন্দ্র।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন মহিমের কাছ থেকে। হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "এ হল ফাঁদ। লোভের ফাঁদ পাতা ভুবনে ! কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে ! অন্‌লি ওয়ান স্টেপ স্যার, অ্যান্ড ইউ ফল। শেয়াল, কুকুর, হাতি, বাঘ, পাখি সব প্রাণীই ফাঁদে ধরা পড়ে। মানুষও।"

মহিমচন্দ্রের ঠিক পছন্দ হল না রসিকতাটা। গুরুগম্ভীর

ব্যাপারের মধ্যে হাসি-তামাশার কী আছে! বিরক্ত মুখে বললেন, "একে আপনি ফাঁদ বলছেন! আমি কিছু বুঝলাম না।"

কিকিরা হালকাভাবেই বললেন, "বুঝলেন না কেন, মশাই। জলের মতন সোজা ব্যাপার। শেখরের কোনও একটা ফাঁদে—আপনি পা জড়িয়ে ফেলেছেন। দিস ইজ অ্যানাদার ফাঁদ। সোনালি ফাঁদ, সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজের খাতায় ধরণীমোহন সেনের নামে বিঘে দুই বসতবাটি-কাম-কমার্শিয়াল প্লট কেনা আছে, আর আছে পাঁচ একর ধানী জমি। জায়গাটা বর্ধমানে। দুর্গাপুর থেকে তিরিশ কিলোমিটার মাত্র। সোনালি ডেভালাপমেন্ট জানতে পেরেছে ক্রেতা ধরণীমোহন মৃত। এখন তাঁর জীবিত ওয়ারিশানরা হয় আইনসঙ্গত প্রমাণ দিয়ে জমিটা নিয়ে নিন নিজেদের হাতে, না হয় এখনকার বাজারদরে সোনালি ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজকে বেচে দিক।... এই তো ব্যাপার মশাই। ভেরি ইজি।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "মেজোবাবু এরকম কোনও জমি-জায়গা কেনেননি।"

"কেনেননি তো বয়েই গেল! কিন্তু এখন কিনেছেন, ১৩৮৬ সনে।"

"কী যে বলছেন আপনি!"

"আমি ঠিকই বলছি। সোনালি কোম্পানির তরফ থেকে এই সাধারণ নোটিসটা পরশু কলকাতার তিনটে বাংলা পত্রিকায় বেরুবে। মনে রাখবেন, সলিসিটার বা আইন-মোতাবেক নোটিস নয়। কোম্পানির সাধারণ নোটিস। বলতে পারেন এজেন্টের নোটিস বা খোঁজখবর।"

"তারপর?"

"তারপর নোটিসেই বলা থাকবে, ওয়ারিশানরা যেন অবিলম্বে

সোনালি কোম্পানির কলকাতার অন্যতম এজেন্ট কিঙ্করকিশোর রায়ের সঙ্গে বিকেল চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে তাঁর বাড়িতে দেখা করেন। দেখা করে কথা বলেন। তিনি পরবর্তী আইনের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেবেন।"

মহিমচন্দ্র মাথা নাড়তে লাগলেন। "এ আপনার ছেলেমানুষি বুদ্ধি।"

"এই বুদ্ধি করেই ধরণীবাবুর ডাক্তারের সঙ্গে আমি আলাপ

করেছি। কথাবার্তা বলেছি। শেখর খোঁজ নিলেই সেটা জানতে পারবে।"

"কিন্তু সে খোঁজ নেবে কেন ? তা ছাড়া সে জানে, মামা তাকে কিছু দিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেসব হল জানা ব্যাপার। ধরণীবাবু বেঁচে থাকার সময়। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির ভাগীদার সে তো হতে পারে আইনত। শেখর লোভী। সে একবার কি ব্যাপারটা

দেখতে চাইবে না !... কী তারাপদ, তোমার কী মনে হয় ?"

তারাপদ একটু ভেবে বলল, "রিস্‌ক নিতেই পারে। দেখতে পারে, সত্যি তার মামার এমন কোনও সম্পত্তি আছে কি না! থাকলে সে অনায়াসে তার দাবি জানাতে পারে।"

চন্দন বলল, "কিকিরা স্যার, আপনি একটু কারেকশান করুন বরং। ওয়ারিশানদের নাম দিয়ে দিন। লাইফ ইনসিওরেন্সে যেমন 'নমিনি'দের নাম থাকে—সেইরকম।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না। তা হবে না।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "আপনি কি মনে করেন শেখর এই নোটিস পড়বে ? পড়ে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসবে ?"

"না আসতেও পারে। কিন্তু উপায় কী ! শেখরের ঠিকানা যখন আপনি জানেন না—তখন তাকে আমি ধরব কেমন করে ? আমার হাতে আর কোনও উপায় নেই। ধরে নিন, এ হল আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া, লেগে গেলেও যেতে পারে।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "শেখর কলকাতায় আছে আমি জানি। আমার কাছ থেকে সেদিনও সে টাকা নিয়েছে। তা ছাড়া কলকাতা ছাড়া তার যাওয়ার জায়গা আছে বলে আমি জানি না।

"কিন্তু বাড়ি ? কোথায় থাকে সে ?"

মহিমচন্দ্র যেন বাধ্য হয়েই বললেন, "রায়মশাই, আমি যখন আপনার হাতে সব তুলে দিয়েছি—তখন আর আপনার কাজে বাধা দেব না। যা ভাল বুঝবেন করবেন। তবে একটা কথা বলি, সোনালি না কী নাম বললেন কোম্পানির—সেই লোকের সঙ্গে দেখা করতে শেখর এ-বাড়িতে আসবে ? এটা কী অফিস ? এলেই তো সন্দেহ করবে ?"

কিকিরা বললেন, "আমি সব ভেবেছি স্যার ! একটা দু' হাতের অফিস ভাড়া করে বসে থাকা আরও রিস্‌কি হবে। কার মুখে কী

শুনবে কে জানে! তার চেয়ে এই ভাল। সে তো অফিসে আসছে না—এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। লেখা আছে বাড়িতে যোগাযোগ করতে।"

"না-হয় এল! তারপর?"

কিকিরা হাসলেন। "একবার আসুক। যদি আসে—তার পরের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলে তারাপদদের দেখালেন, "আমার দুই শাগরেদকে দেখছেন তো! বগলাও আছে।"

মহিমচন্দ্র আরও খানিকক্ষণ বসে উঠে পড়ছিলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনার কিছু খরচপত্র লাগবে! এই বিজ্ঞাপনটা কাল তারাপদ কাগজের অফিসে-অফিসে দিয়ে আসবে। স্পেশ্যাল বিজ্ঞাপন।"

মহিমচন্দ্র অ্যাটাচি খুলে টাকা বের করলেন। কী ভাবলেন যেন, তারপর দু-তিন হাজার টাকা এক থোকে বের করে এগিয়ে দিলেন।

"আমি উঠি?"

"আসুন।"

"তারা আপনাকে নিচে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

"না না, কী দরকার!"

"যাক না!... আচ্ছা মহিমবাবু, আপনার গাড়ি কে চালায়?"

"দুর্গা।"

"বিশ্বাসী!"

"বলেন কী! কবে থেকে গাড়ি চালাচ্ছে!"

"জটা বলে আপনাদের কোম্পানিতে এক ড্রাইভার আছে না?"

মহিমচন্দ্র অবাক হলেন। "হ্যাঁ। কেন?"

"সে ভ্যান চালায়?"

"চালায়। ডেলিভারি ভ্যান। রঙের ছোট-বড় কৌটো ডেলিভারি দিতে যেতে হয় দোকানে। অন্য কাজও থাকে খুচরো। জটা শুধু ড্রাইভার নয়, বিল আদায়ও করে।"

"ও আগে কী করত ?"

"এই কাজই করত। কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন ?"

"করছি। জটার সঙ্গে শেখরের ভাব ছিল ?"

মহিমচন্দ্র এবার কেমন চমকে গেলেন। তাকিয়ে থাকলেন। কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

কিকিরা বললেন, "সেদিন ওই ডেলিভারি ভ্যানে ধরণীবাবু অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। জটা সেদিন গাড়ির ড্রাইভার ছিল।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "রায়মশাই, মেজোবাবু জোর করে জটাকে নিয়ে ডেলিভ্যারি ভ্যানে বাড়ি যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, ফেরার পথে কোনও কাজ আছে, সেরে ফিরবেন।"

"কী কাজ আপনি জানতেন না ?"

"না।"

"আপনাকে বলেননি ?"

"না।"

"পরে, যখন ওইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল—আপনি কিছু জানতে চাননি ?"

"পরে চেয়েছিলাম।... জটা বলল, গাড়িতে সামান্য জিনিস ছিল—স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে নামিয়ে দেওয়ার পর মেজোবাবু বললেন, একবার ডেকার্স লেনে যেতে। সেখানে আধঘণ্টা মতন ছিলেন। তারপর বাড়ি যান।"

"ডেকার্স লেনে কে থাকে ?"

"আমি জানি না।"

"আন্দাজও করতে পারেন না ?"

"না।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "অত শরীর খারাপ সত্ত্বেও ডেকার্স লেনে গেলেন !"

"তাই গিয়েছিলেন।"

"তখনও শরীর খারাপ লাগছিল, না, একটু ভাল মনে করছিলেন ?"

"কেমন করে বলব ?"

"জটা কী বলল ?"

"জটা বলল, তখনকার মতন একটু ভাল।"

"ও !" চন্দন এবার কথা ঘুরিয়ে নিল। "মহিমবাবু, একটা সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করছি।"

মহিমচন্দ্র তাকালেন।

চন্দন বলল, "ধরণীবাবুর শুনলাম ওষুধ খাওয়ার খুব বাতিক ছিল। হরদম অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আর মাথা-ধরার বড়ি খেতেন। এই বাতিক নিশ্চয় অনেকদিনের ?"

"হ্যাঁ। তবে ইদানীং বেড়ে গিয়েছিল।"

"কতদিন ?"

"তা দু-তিন বছর।"

"কোন ওষুধ খেতেন বলতে পারেন ?"

"বলা মুশকিল। খেয়াল মতন খেতেন। যখন যেটা বাজারে উঠত বা কেউ বলত—সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কিনে এনে খেতে শুরু করতেন। আবার ক'দিন পরে ছেড়ে দিতেন। পাগলামি।"

"এরকম অভ্যেস অনেকের থাকে। নিজেরাই ডাক্তার।...তা আপনি কি জানেন, সেদিন উনি কোন ওষুধ খাচ্ছিলেন ?"

"না মশাই, জানি না।"

"মনে করতে পারেন ?"

"না।" মহিম মাথা নাড়লেন। "মেজোবাবুর টেবিলে ওষুধের পাতা—স্ট্রিপ পড়ে থাকতে দেখেছি। ওই যে আজকাল যেমন পাওয়া যায়—একদিকে প্লাস্টিক অন্যদিকে রাংতা বা কাগজ—ওই ধরনের।"

চন্দন চুপ করে গেল।

মহিমচন্দ্রই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, সন্দেহের গলায়, "আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? ওষুধের সঙ্গে কী সম্পর্ক ?"

চন্দন মাথা নাড়ল। সতর্ক হয়ে গেল। বলল, "না—এমনি জিজ্ঞেস করছি। ওষুধ মানেই যে সবসময় ভাল, তা তো নয়। খারাপও হয়ে যায়। ধরণীবাবু যেভাবে আচমকা মারা গেলেন..." কথাটা আর শেষ করল না চন্দন।

মহিমচন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। বরং হঠাৎ একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে কিকিরাকে বললেন, "আমি চলি রায়মশাই।"

"আসুন। তারাপদ আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিক।"

তারাপদ উঠে পড়েছিল।

পা বাড়িয়ে মহিমচন্দ্র কিকিরাকে বললেন, "আপনি শেখরকে হাজির করতে পারবেন কি না আমি জানি না। যদি পারেন, খুব সাবধান ! শেখর যত চালাক, তত নিষ্ঠুর। ওর কাছে ছোরা-ছুরি থাকে, হয়তো পিস্তলও। ওর সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। নজর রাখবেন।"

কিকিরা একটু হেসে বললেন, "মহিমবাবু, আমি তো আদতে ম্যাজিশিয়ান। পিস্তল, ছোরা-ছুরি দেখলে ম্যানড্রেকের মতন ভেলকি দেখিয়ে দেব।"

তিন-চারদিন পরে এক বিকেলে বগলা এসে বলল, একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে।

কিকিরা ঘড়ি দেখলেন। সোয়া পাঁচ। সাড়ে পাঁচ কিংবা পৌনে ছয়ের আগে তারাপদ আসতে পারবে না। তারাপদ বা চন্দন একজন কাউকে দরকার হতে পারে বলে তিনি সেইরকমই ব্যবস্থা করেছেন। মানে যে এসেছে সে যদি শেখর হয়—তবে শেখর চলে যাওয়ার পর তাকে ফলো করতে হবে। লোকটার পাত্তা জানা দরকার কিকিরার।

কিকিরা একটু গুছিয়ে নিলেন নিজেকে, তারপর বললেন, "কেমন ছেলে ? চোখে চশমা আছে ?"

"আছে।"

"ত্রিশ-বত্রিশ বয়েস ?"

"তা হবে।"

"ডাকো। ... চা করবে আমাদের জন্যে... ।"

বগলা চলে গেল। একটু পরেই ঘরে এল শেখর।

কিকিরা চিনে নিতে পারলেন। ফোটো দেখেছেন। পরনে পাজামা, গায়ে ঝুলওয়ালা রঙিন পাঞ্জাবি। পোশাক পরিচ্ছন্ন। দেখতে বেশ ভালই শেখরকে। মাথার চুল কোঁকড়ানো। গায়ের রং ফর্সা। চিনে নেওয়া সত্ত্বেও কিকিরা অবাক হওয়ার ভান করে তাকিয়ে থাকলেন শেখরের দিকে।

শেখর ঘরে ঢুকে কেমন সন্দিগ্ধভাবে কিকিরাকে দেখতে

লাগল। ঘরটাও তাকে রীতিমতন অবাক করছিল।

কিকিরা নিজের পরিচয় দিলেন। "আমার নাম কিঙ্করকিশোর রায়। সোনালি ল্যান্ড ডেভোলাপমেন্টের একজন এজেন্ট। কলকাতার। আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কাগজে নোটিস দেখে?"

"হ্যাঁ। আমার নাম শেখর গুহ।"

"শেখর গুহ! ...ও ! বসুন, বসুন। বসে পড়ুন। আমার এই ঘর এইরকমই। ফেয়ারলি প্লেস...!" বলে নিজেই হাসতে লাগলেন।

"ফেয়ারলি প্লেস?"

"লোকে তাই বলে, সাজানো-গোছানো দেখে ঠাট্টা করে বলে। বলুক। নামে কী আসে-যায়!"

"আপনি আমার নামটা যেন শুনেছেন মনে হচ্ছে!" শেখর বলল।

কিকিরা হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের জানতে হয়, স্যার। যে-কাজ করি, সেটা বড় ভজকটো। ...মানে, আমাকে ডাক্তার মুখার্জির কাছে যেতে হয়েছিল। তিনি তো ধরণীবাবুর ডাক্তার ছিলেন। শেষ সময়েও দেখেছেন। ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছেন, তাই না! তিনি আপনাদের কথা বললেন!"

"মুখার্জির কাছে কেন গিয়েছিলেন?"

"বলেন কি, স্যার! এ কোশ্চেন অব ডেথ! কোম্পানির ফ্যাকড়া কত! শিওর হতে হবে একশো ভাগ। আপনি কর্পোরেশান থেকে মামার মৃত্যুর পর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছেন?"

শেখর এবার ফাঁপরে পড়ে গেল। "না।"

"না কেন ? এক বছর হয়ে গেল ! এখনও ডেথ সার্টিফিকেট বের করতে পারলেন না !"

শেখর ইতস্তত করতে লাগল। "জানতাম না। মানে, সময় হয়ে ওঠেনি।"

"অবশ্য কর্পোরেশন থেকে কাজ বের করা কঠিন। ভীষণ সময় নেয়। কেউ কিস্যু করে না স্যার।... কিন্তু সার্টিফিকেটটা যে দরকার। লিগ্যালি দরকার।"

শেখর কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল। "সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজের এই অফিস— !"

"অফিস ! অফিস কেন হবে ! আমাদের মেইন অফিস দুর্গাপুরে, আসানসোলেও বড় অফিস আছে। দু-চার জায়গায় ছোটখাট অফিসও করেছি। কলকাতায় স্যার আগে কিছু করিনি। ভাল জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন জোকায় একটা নিজেদের জমি কিনেছি।"

শেখর বলল, "কলকাতা ছাড়া ব্যবসা হয় !"

"কলকাতায় স্যার আমাদের কে আর পুঁছবে ! এখানে গণ্ডায়-গণ্ডায় প্রোমোটার। মফস্বলে আমাদের কাজকর্ম হয়। কলকাতার লোক এই দশ-বারো মাইল এলাকা ছাড়া বোঝে না। বাইরের লোক বোঝে। আর আমাদের মেইন কারবার তো বর্ধমান জেলা নিয়ে। কোম্পানিও নতুন বলতে পারেন।"

কিকিরা বুঝতে পারছিলেন শেখর তাঁকে সন্দেহ করছে। তাতে অবশ্য তিনি ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন না।

"মামার এই সম্পত্তি নিয়ে এতদিন পরে আপনাদের কোম্পানি মাথা ঘামাচ্ছে ! এক বছর পরে ?"

কিকিরা হাসলেন। "স্যার ঠিক খোঁজখবর রাখেন না। মৃত মানুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে এক বছর তো কিছুই

নয়, দশ বছরও হতে পারে। আইনের অনেক মারপ্যাঁচ আছে। তা ছাড়া ধরণীবাবু কোথাও লিখে যাননি তাঁর মৃত্যুর পর কে-কে ওয়ারিশান হবে! উনি মারা গেছেন জানতেই আমাদের ছ'-সাত মাস কেটে গেল। তারপর খোঁজখবর শুরু করতে গিয়ে এখান-ওখান। ডাক্তার মুখার্জি। ...আরে মশাই, কাগজে ওই যে নোটিস—শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপা হল—তারপরই তো বেশি করে টনক নড়ল আমাদের।"

শেখর পকেট থেকে বিলেতি সিগারেটের প্যাকেট বের করল। "ও! ওটা আপনাদের চোখে পড়েছে?"

"পড়বে না! কতখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হয়েছে!"

"সিগারেট খান?"

"দিন। আমি হলাম মিনি চুরুটের ভক্ত। গেঁয়ো লোক স্যার। মানকরে বাড়ি। কলকাতায় একটা আস্তানা রেখেছি—নানান কাজ করতে হয় বলে। জ্যাক অব অল ট্রেড্স।"

শেখর লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেও ধরাল।

বগলাকে ডাকলেন কিকিরা। "কী হল চায়ের? ও বগলা?"

সাড়া দিল বগলা।

সিগারেট খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "এবার একটু কাজের কথা হোক।"

"হোক। ...তার আগে আমায় একটু জল খাওয়ান যদি! যা গরম!"

কিকিরা বললেন, "সে কী স্যার! আনছি।" বলে নিজেই উঠে পড়লেন জল আনতে।

ফিরে এলেন সামান্য পরে জল নিয়ে। এগিয়ে দিলেন জলের গ্লাস।

“আপনি আর আপনার দাদা মৃত ধরণীবাবুর সোনালি কোম্পানির জমিজমার ওয়ারিশান,” কিকিরা বললেন, “তাই না !”

“জমি তো মামার। আপনি সোনালি কোম্পানির নাম করছেন কেন ?”

কিকিরা আগেভাগেই সব ভেবে রেখেছিলেন। বললেন, “অবশ্য, অবশ্য। জমি আপনার মামার। কিন্তু একটা শর্ত যে ছিল, স্যার। জমি নেওয়ার সময় বাকি কিস্তি—সে প্রায় কিছুই নয়—পাঁচ-সাত হাজার টাকা—শোধ করে দিতে হবে। তারপর দলিল রেজিস্টারি হবে।”

শেখর তাকাল। “ও ! তাই !”

“এখন স্যার তিনটে কাজ আপনাকে করতে হবে। মানে আপনাদের। কর্পোরেশান থেকে ডেথ সার্টিফিকেটটা জোগাড় করুন, বাকি কিস্তিটা দিয়ে দিন, আর আইন মোতাবেক একটা চিঠি দিন আপনারা—ব্যস !”

বগলা চা আর মিষ্টি এনে দিল।

“এসব আবার কেন ?” শেখর বলল।

“কিছু না। আপনি আমার ক্লায়েন্ট। আপনাদের জন্যেই আমরা।”

শেখর হঠাৎ বলল, “ক্লায়েন্টের জন্যে আপনি কী করেন ?”

কিকিরা বুঝতে পারলেন। তিনিই টোপ দিয়েছেন যে ! হেসে বললেন, “স্যার, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।”

“ও তো বুঝলাম। এখানে অবস্থা...”

“ডেথ সার্টিফিকেট, উকিল—এ দুটো আমার হাতে ছাড়তে পারেন।”

“কত লাগবে ?”

“সে আর কী বলব ! হবে। কিন্তু আপনার দাদা—”

"বাদ দিতে পারেন না ?"

"বা-দ ! তা কেমন করে হয় ! আইন বলে কথা !"

"রাখুন আইন। আইন মানেই বে-আইন। ...কেন, আমার মামা আমাকে একলা কিছু জমি-জায়গা দিয়ে যেতে পারে না ?"

কিকিরা যেন ভাবতে-ভাবতে বললেন, "তা পারেন। তবে ওই পুরনো কাগজপত্রে একটু জাল-জালিয়াতি করতে হবে। মানে, দেখাতে হবে যে—আপনাকেই একমাত্র ওয়ারিশান করেছিলেন জমি-জায়গার।"

চা খেতে-খেতে শেখর বলল, "তাই করবেন।"

"স্যার, অনেক খরচ পড়ে যাবে।"

"আপত্তি নেই। আমি যদি মালিকানা সোনালিকেই বেচে দিই—আপনারা তো নেবেন বলেছেন—তা হলে কত পেতে পারি ?"

"বাজারদরই পাবেন। সামান্য কম।"

"কত পাব ?"

"হিসেব করে বলতে হবে। আন্দাজ চল্লিশ, বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ।"

"বেশ। আপনি পাঁচ পাবেন। ...সব মিলিয়ে।"

কিকিরা এবার একটু হাসলেন। বললেন, "কম হয়ে যাচ্ছে। অনেক কাজ স্যার। ...তার ওপর এই যে একটা ফ্যাকড়া বাঁধিয়ে রেখেছে।"

"কিসের ফ্যাকড়া ?"

"পড়েননি ? দেখেননি মন দিয়ে ! রাহা কোম্পানির ওই ছাপানো লেখায় যে বলা আছে, মৃত্যুটা রহস্যময়। তার কোনও কিনারা আজ পর্যন্ত হল না। ধরুন, হঠাৎ করে কেউ যদি ওই প্রশ্নটা তোলে !"

শেখর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। "ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার ব্যাপার।"

কিকিরা কিছু বললেন না।

শেখর এবার উঠে পড়ল। "আপনি এগিয়ে যান, আমি আছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে শিয়ালদার মুন হোটেলে যাবেন। তেতলায় বাইশ নম্বর ঘর।"

"বাইশ নম্বর। ...তা আপনি একদিন আসুন না স্যার। আমি একটু নাড়াচাড়া করে দেখি সব।"

"আমি আসব?"

"আসুন না!"

"কবে?"

"আসছে হপ্তায়। বুধবার।"

"ঠিক আছে।"

শেখর উঠে পড়ল।

কিকিরা তাকে এগিয়ে দিতে গেলেন।

সিঁড়িতে তারাপদর সঙ্গে দেখা।

তারাপদ কিছু বলবার আগেই কিকিরা বললেন, খানিকটা রাগের গলায়, "বাড়িভাড়া নিতে আসার এটা সময়, মশাই! সারাদিন করছিলেন কী? ...ওপরে যান, আমি আসছি।"

তারাপদ দেখল শেখরকে। বুঝতে পারল। ফোটো দেখেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল তারাপদ।

নিচে নেমে শেখর বলল, "আপনার বাড়িওয়ালা?"

"বাড়িওয়ালার কর্মচারী। এদিককার দু'-তিনটে বাড়ির মালিক এক মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর অন্য কিছু ছোটখাটো কারবারও আছে। ছোকরা সেখানে কাজ করে।"

নিচে নেমে শেখর সামান্য দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ট্যাক্সি ধরল।

"আসি মশাই।"

"আসুন স্যার।"

"ওহো, ভাল কথা। আপনার ঘরে বোধ হয় আমি সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। খেয়ে নেবেন।"

কিকিরা আরও একটু হেসে বললেন, "আপনি বড় অন্যমনস্ক। পকেটের মানিব্যাগটাও পড়ে গিয়েছিল। এই নিন। নিয়ে যান।" কিকিরা ব্যাগ দিলেন শেখরকে।

কিকিরা ফিরে এসে দেখলেন, তারাপদ তার নিজের কোণের জায়গাটিতে বসে আরাম করে সিগারেট টানছে। চোখ প্রায় বোজা। সিগারেটের চেহারাটা লম্বা। বোঝাই যায়, শেখরের ফেলে যাওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিয়েছে তারাপদ।

কিকিরাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বললেন, "হ্যা-ল্‌-লো, তারাবাবু! কী বলেছিলাম!"

তারাপদ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিলেতি সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

"ফেলে গিয়েছে। শ্রীমান শেখর গুহ... !" কিকিরা বললেন।

"ফেলে গিয়েছে, না, আপনাকে দিয়ে গিয়েছে?"

"দিয়ে গিয়েছে! গিফ্‌ট... !"

"উইথ এ নোট—টাকা নয় স্যার, শুধু একটা লাইন। প্যাকেটের মধ্যেই আছে।"

কিকিরা অবাক হলেন। "তাই নাকি? কই দেখি... !" প্যাকেটের মধ্যে রাংতার আলতো কাগজে লেখা : 'চালাকি হইতে

সাবধান।' কাগজটা পাট করে গুঁজে দেওয়া। দেখলেন কিকিরা। অবাক হয়ে বললেন, "বাঃ, এ তো একেবারে বুনো ওল হে!"

"আপনাকে ভেলকি দেখিয়ে গেল।"

"তা ঠিক। গোড়া থেকেই কারবারের রকম-সকম জানে। তবে বাছাধন পালাতে পারবে না। কমিশন কেটে নিয়েছি।"

"আপনার কমিশন?"

"ওই আর কী! খরচা!"

"চমৎকার।"

"তারাবাবু, শেখর আমায় সাবধান করে দিয়ে গেছে। নিজেও ধরা পড়েছে যে! ওর মানিব্যাগ থেকে যে আমিও কিছু উদ্ধার করেছি।"

তারাপদ তাকাল। "উদ্ধার করেছেন?"

"পকেট মেরেছি।"

"পকেট মেরেছেন?"

কিকিরার যেন কিছুই হয়নি, স্বাভাবিক ভাব করে শেখরের ফেলে যাওয়া প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আঙুলে ঠুকতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো! শেখর কথার মধ্যে এক গ্লাস জল খেতে চাইল। আমি উঠে গেলাম বগলাকে বলতে। নিজেই জল নিয়ে এলাম। এরই মধ্যে ও কাজটা সেরে রেখেছিল। আমি ওর পাঞ্জাবির পকেটে চকচকে ডট পেন দেখেছি। তবু বলব, ছোকরা বুদ্ধিমান। আমার ঘরে এসে আমায় বোকা বানিয়ে গেল! কিন্তু নিজেও যে কত বড় বোকা বনে গেছে—হোটেলে গিয়ে বুঝতে পারবে। আগেও পারতে পারে—মানিব্যাগ খুললে।"

তারাপদ বলল, "বুঝলাম না।"

কিকিরা জামার পকেট থেকে কয়েকটা টুকরো কাগজ আর একটা চাবির রিং বের করলেন। রিংয়ে দুটিমাত্র চাবি।

কাগজগুলো কিকিরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে একবার দেখেছিলেন। এবার ভাল করে দেখলেন। বললেন, "একটা রসিদ। হোটেলের। এই কাগজটা ব্যাঙ্কের। খুচরো। স্লিপে টাকা জমা দিয়েছে। 'শেখরচন্দ্র গুহনিয়োগী' নামে। বেনামী অ্যাকাউন্ট। বোধ হয়, তারিখ দেখে মনে হচ্ছে, মহিমচন্দ্রের কাছ থেকে শেষ টাকা নেওয়ার পর সেই টাকার কিছুটা গচ্ছিত রেখেছিল। আর তিন নম্বর কাগজটায় একটা ফোন নম্বর লেখা আছে। তলায় আবার লেখা 'বারো'। কার ফোন—নাম নেই।"

"চাবি দুটো ?"

"বোধ হয় হোটেলের।" কিকিরা ভাল করে দেখলেন। বললেন, "আমায় ধাপ্পা দিয়ে বলে গেল শিয়ালদার মুন হোটেলের তেতলায় বাইশ নম্বর ঘরে থাকে। রসিদে দেখছি, এটা নিউ সেন্ট্রাল হোটেল। প্রিন্সেপ স্ট্রিট।"

তারাপদ হাসল। "আপনাকে তা হলে... !"

কথা শেষ হওয়ার আগেই চন্দনের গলা পাওয়া গেল।

চন্দন ঘরে আসতেই তারাপদ মজার গলায় বলল, "চাঁদু, কিকিরার সঙ্গে শেখরের মোলাকাত হয়ে গেছে। একটু আগে। শেখর একেবারে স্যারের কৃতিত্বে মুগ্ধ। বিলেতি সিগারেট প্রেজেন্ট করে গিয়েছে। খা। স্যারের কাছে আছে।"

তারাপদর রগুড়ে কথাবার্তায় কান দিলেন না কিকিরা। চন্দনকে বসতে বললেন। তারপর কী ঘটেছে বিকেলে, তার বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন।

চা নিয়ে এসেছিল কালা।

চা খেতে-খেতে বৃত্তান্ত শোনানো শেষ হল।

চন্দন বলল, "আপনার এত কষ্টের সোনালি তো তা হলে ডকে উঠে গেল কিকিরা। ধরা পড়ে গেলেন।"

কিকিরা মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, "ধরা না দিলে ধরা যায় না অনেক সময়। শেখরকে যখন একবার খুঁজে পেয়েছি, তাকে কি আর পালাতে দেওয়া যায়! হয় ওকে ফিরে আসতে হবে এখানে, না হয় আমি যাব।"

"নিউ সেন্ট্রাল হোটেলে?"

"হ্যাঁ, সেখানে যাব। ব্যাঙ্কে যাব। ব্যাঙ্কের কাগজটা বেশি কাজে লাগবে। বেনামা অ্যাকাউন্ট। সেখানে আবার কী ঠিকানা দিয়েছে কে জানে!"

"ফোনের নম্বরটা কার? ওর হোটেলের?"

"বুঝতে পারছি না।"

"মহিমচন্দ্রের নিশ্চয়ই নয়।"

"না। মহিমচন্দ্রের ফোন নম্বর টুকে রাখার কারণ নেই।" বলতে-বলতে কিকিরা হঠাৎ চন্দনকে বললেন, "চাঁদু, এক কাজ করো। নিচে চলে যাও। বড় রাস্তায় দীননাথ স্টোর্স পাবে। ফোন আছে দোকানে। আমার নাম করে ফোন করতে চাইবে। টাকা নিতে চাইবে না ছোকরাগুলো। কল-চার্জ দিয়ে দিয়ো জোর করে। নাও, চলে যাও—এই নাও ফোন নম্বর। ধরবার চেষ্টা করে দেখো—কার নামের ফোন। ...নিচে একটা নম্বরও আছে, বারো। কিসের নম্বর?"

চন্দন ফোন নম্বরের টুকরো কাগজ নিয়ে চলে গেল।

কিকিরারা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অন্তত দশ-পনেরো মিনিট পরে ফিরে এল চন্দন। কেমন যেন বিমূঢ়। বলল, "স্যার, এই ফোন তো নার্সিং হোমের। রিপন স্ট্রিটের নার্সিং হোম। নার্সিং হোম শুনে আমি তাজ্জব! তারপর

কী খেয়াল হল, বারো নম্বর আর শেখরের নাম বলতেই নার্সিং হোম থেকে বলল, "পেশেন্ট ঠিক আছে।"

কিকিরা আর তারাপদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

গায়ে গা লেগে যাওয়ায় শেখর দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। সামান্য রুক্ষ চোখেই।

"স্যরি।"

"গায়ের ওপর এসে পড়ছেন যে !"

"এসে পড়িনি, ঠেলা খেয়ে গায়ে পড়ে গিয়েছি। নার্সিং হোমের বেরুবার জায়গাটা এত ন্যারো।"

"ঠিক আছে।" শেখর পা বাড়াল।

"আপনার পেশেন্টের কত নম্বর ঘর ?"

শেখর রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। নার্সিং হোমে লোক ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে। জায়গাটায় ভিড়। তাকাল পাশের লোকটার দিকে। "আপনার দরকার ?"

"এমনি ! আমারও এক পেশেন্ট আছে এখানে। আমি ডাক্তার।"

"ডাক্তার !"

চন্দন হাসল। তার স্টেথ্সকোপটা প্যান্টের পকেটে উঁকি দিচ্ছিল। গায়ে কোনও অ্যাপ্রন নেই।

চন্দন আলাপি গলায় বলল, "আমার ডিরেক্ট পেশেন্ট নয়। এক বন্ধুর পেশেন্ট। বলেছিল, একবার দেখে যেতে। কেসটা

একটু সিরিয়াস। তবে ক্রাইসিস কেটে গিয়েছে অনেকটা।"

"ও! ভাল!"

"আপনার পেশেন্ট ... ?"

"গাড়ির ধাক্কা। মাথায় লেগেছিল!"

"মাথায়! তবে তো ..."

"এখন অনেকটা ভাল।"

"গুড নিউজ!"

বলতে বলতে শেখর আরও খানিকটা ফাঁকায় আসতে পাশের ফুটপাথ থেকে কে যেন এগিয়ে এল। "গুড ইভ্‌নিং, স্যার।"

শেখর তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। সেই লোকটা। রায়।

কিকিরা আবার বললেন, "গুড ইভ্‌নিং স্যার।"

কথার জবাব দেবে না ভেবেছিল শেখর। তাকিয়ে চলে যাবে ভাবছিল, চোখে পড়ল আরও একজনকে—তারাপদকে।

শেখর বুঝতে পারল, পালিয়ে লাভ নেই, মুখোমুখি দাঁড়ালেই ভাল।

"কী দরকার আপনার ?" শেখর বলল।

"আমায় চিনতে পারছেন না!"

"বেশ পারছি।"

"আপনি স্যার আমায় ভুল ঠিকানা দিলেন! সব ভুল!"

"আপনি নিজে কি আমাকে সত্যি কথাটা জানিয়েছেন! চালাকি করতে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে! সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট ...! নিজের ভাঁড়ার ঘরে বসে ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট ... !"

"ভাঁড়ার ঘর বলছেন কী! ওটা আমার জাদুঘর।"

"জাদুঘর! মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ! ... শুনুন মশাই, বটতলার

বই পড়ে ছিঁচকে গোয়েন্দা হওয়া যায়—আসলে মুখ্যু মাথামোটারা আপনার মতন গোয়েন্দা হয়—ভাঁড় !"

"স্যার, আমি গোয়েন্দা নই। আমার বাপ-ঠাকুরদা কোনওকালে গোয়েন্দা ছিল না। বিলিভ মি !"

"আপনি কী ?"

"কিকিরা। কিঙ্করকিশোর রায় থেকে কিকিরা। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান।"

"তা বুঝতে পারছি। পকেটমার ম্যাজিশিয়ান।"

কিকিরা রাগ করলেন না ; হাসতে হাসতে বললেন, "শুনুন শেখরবাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই। আমরা যদি বসে বসে দুটো কথা বলতাম, ভাল হত। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। চলুন না, কোথাও বসি। বড়জোর আধঘণ্টা।"

শেখর মাথা নাড়ল। "আপনি ওই মহিম লোকটার ভাড়া করা গোয়েন্দা !"

"কে বলেছে আপনাকে ?"

"আমার লোক আছে। আপনারা দু'জন হাওড়ায় রঙ কারখানায় গিয়েছিলেন। হেম পালিত লেনের বাড়িতেও আসা-যাওয়া করেন।"

তারাপদ অনেক আগেই কিকিরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চন্দন ঠিক শেখরের পেছনে।

কিকিরা বললেন, "কারখানার লোক আপনাকে জানিয়েছে ?"

"জানাবার লোক আমার অনেক আছে।"

"আমি স্যার সত্যিই মুখ্যু। তবে গোয়েন্দা নই। ... এখন কথা হল—আপনি আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলতে চান, না ওই নার্সিং হোমে যে পড়ে আছে, তার ভাল চান !"

"মানে !"

"আমি জটার কথা বলছি। জটিলেশ্বর—" বলে চন্দনকে ইশারায় দেখালেন। "ও চন্দন। ডাক্তার। হাসপাতালে আছে। আমার শাগরেদ। ... একটা কথা আছে জানেন তো, দি ফ্ল্যাগ অব ধর্ম ফ্লাইজ উইথ দ্য উইন্ড। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কলটাকে আমি পতাকা করে নিয়েছি।" একটু থামলেন কিকিরা, মুচকি হাসলেন। "যাই বলুন, আপনার মানিব্যাগে পাওয়া টুকরো কাগজগুলো, ওই ফোন নম্বরটাও আমাদের ভীষণ কাজে লেগেছে।"

"বুঝেছি।"

"চন্দন ওই ফোন নম্বরে ফোন করতে ওরা রিপন স্ট্রিটের এই নার্সিং হোম থেকে সাড়া দিল। তারপর চন্দন থতমত খেয়ে আপনার নাম বলল, আর ফট করে বারো নম্বরটা বলে দিল। ব্যস—সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল ওই নার্সিং হোমে বারো নম্বর পেশেন্ট আপনার লোক। অন্তত চেনা লোক।"

শেখর বলল, "অনেকটাই এগিয়েছেন তা হলে ! বাকিটাও এগিয়ে যান। যদি আটকে যান, আমার কাছে আসবেন। আমার হোটেলে। আসল হোটেলে। তবে জানবেন, জটাদার যদি কিছু হয়—সে আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়ব না। আমি তাকে খুন করব, যদি দরকার হয়। ... নিন, সরুন। ভদ্রলোকের এক কথা। কথা বলতে হয় আমার হোটেলে আসবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমায় ভয় দেখাবেন না।" শেখর কিকিরার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনই নাটকীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিকিরা বললেন, "চলো।"

প্রায় চুপচাপ খানিকটা এগিয়ে এসে কিকিরা চন্দনকে বললেন,

"চাঁদু, জটিলেশ্বরের ইনজিয়ুরি কেমন ?"

"সিরিয়াস নয়।"

"তবে যে বলছে..."

"হাতে রেখে বলছে।"

"জটার এই অ্যাক্সিডেন্টের কথা মহিমচন্দ্র আমাকে বলেননি। চেপে গেছেন। আর একটা ব্যাপার দেখেছ ? ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র তিন-চার দিন আগে। মানে, মহিমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পর—"

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার সোনালির নোটিশ যেদিন কাগজে ছাপা হল, সেই দিনই বোধ হয়।"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন।

চন্দন বলল, "এই নার্সিং হোমে আমার নিজের জানা চেনা তেমন কোনও ডাক্তার নেই। তবে মনোজদা এখানে কেস নেয়। মনোজদার পেশেন্ট থাকে। তাকে বলে নার্সিং হোমে ঢুকেছি। দু-একজনের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছি। ডাক্তারে-ডাক্তারে চট করে ভাব হয়ে যায়, জানেন তো ! আপনি ভাববেন না, এদিকটা আমি ম্যানেজ করব !"

কিকিরা একটা চুরুট ধরাবার জন্য দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন। বললেন, "জটার হল অ্যাক্সিডেন্ট, আর তাকে নার্সিং হোমে ঢুকিয়ে দিল শেখর। ব্যাপারটা মন্দ নয় !"

তারাপদ বলল, "তা এখন কী করবেন আপনি— ?"

"কী করব ! কেন, শেখর তো বলেছে সে ভদ্রলোক। এক কথার মানুষ সে। তার হোটেলে গিয়ে কথা বলতে বলেছে—অবশ্য যদি আমরা কথা বলতে চাই। ... তা যাব বইকি ! শেখরের হোটেলেই যাব। দেখা যাক কী হয় !"

দরজা খুলে দিল শেখর। দরজায় কিকিরা। দেখল কিকিরাকে।

"কী, ভেতরে আসব ?"

"আসুন।"

"আমার সঙ্গীরাও আছে।"

"সঙ্গী ! ডাকুন তাদের।"

কিকিরা তারাপদদের ডাকলেন।

দরজা বন্ধ করে দিল শেখর।

হোটেলের ছোট ঘর। মামুলি আসবাব। বিছানা ছাড়া বসবার চেয়ার দুটি মাত্র।

কিকিরা বললেন, "ভদ্রলোকের এক কথা, আপনিই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দরকার থাকলে দেখা করতে পারি। কালই আসতাম, পারিনি। আজ এলাম।"

"বসুন।"

হোটেল ঘরের বিছানাতেই বসলেন কিকিরা। তারাপদদের বসতে বললেন ইশারায়। ওরা চেয়ারে বসল।

কিকিরা কিছু বলার আগেই শেখর বলল, "বলুন, কী বলতে চান ?"

কিকিরা বললেন, "আপনি কাল মহিমবাবুকে ফোন করেছিলেন ?"

শেখর দু' মুহূর্ত দেখল কিকিরাকে। "হ্যাঁ।"

"আবার টাকা চেয়েছেন ?"

"চাইতেও পারি। মহিম রাহা বলেছে আপনাকে !"

"টাকা তো আর পাবেন না।"

শেখর ভুরু কোঁচকাল। "পাব কি পাব না, আপনি কেমন করে জানলেন ? রাহা আপনাকে পাঠিয়েছে ?"

"হ্যাঁ বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। আমি নিজে এসেছি। ... আপনার তহবিলে তো অনেক টাকা জমা পড়েছে। আর কেন ?"

"আরও পড়বে। আসলের সঙ্গে মাঝে-মাঝে সুদ দিতে হয়। আপনাদের যখন লাগিয়েছে, তখন সুদ তো দিতেই হবে।"

কিকিরা দেখলেন শেখরকে। একটু হাসলেন। "কাউকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা অপরাধ, তা আপনি জানেন! যে-কোনও ধরনের ব্ল্যাকমেইলিং—ক্রিমিন্যাল অফেন্স !"

"জানি।"

"ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারে।"

"মহিম রাহা পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনাদের পাঠাল কেন ? তাকে বলুন না, পুলিশের কাছে যেতে।"

কিকিরা সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "অগত্যা তাই যেতে হবে। ... আর পুলিশের কাছে গেলে আপনিই কি ছাড়া পাবেন—, নানা জালে জড়িয়ে পড়বেন।"

"তাই নাকি ! যেমন ?" শেখর মুখ টিপে হাসল যেন।

"আপনি জানেন না বুঝি কোন-কোন জালে জড়াতে পারেন !" বলতে-বলতে কিকিরা পকেট থেকে কী যেন বের করলেন। দেখালেন না। বললেন, "যদি বলি, ধরণীমোহন সেন—আপনার মামাকে—আপনি মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন— ।"

শেখর হঠাৎ চটে গেল। "না। আমি কোনও ষড়যন্ত্র

করিনি। আর ধরণী সেন আমার মামাও নয়।"

কিকিরা কেমন থমকে গেলেন। তাকালেন তারাপদদের দিকে। তারাও অবাক হয়ে শেখরকে দেখছিল।

"মামা নয়! কী বলছেন! সবাই জানে আপনি ধরণীবাবুর ভাগ্নে।"

"সবাই কী জানল, তাতে আমার কী এসে-যায়! আমি ধরণী সেনের ভাগ্নে নই।"

"তবে আপনি কে?"

"ধরণী সেনের সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আমি ওঁর দিদির নিজের ছেলে নই। পালিত পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই। ওঁকে আমি 'মা' বলতাম। ধরণী সেনকে 'মামা' বলতাম ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি কোনওদিন ভাগ্নের মতন ব্যবহার, আলাদা কোনও স্নেহ-মমতা পাইনি। তিনি আমায় পছন্দ করতেন না।"

কিকিরা অবাক হয়ে গেলেন। তারাপদরাও যেন বোকার মতন শেখরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

শেখরের চোখমুখের ভাব, তার স্পষ্ট ও শক্ত কথা বলার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, সে মিথ্যে কথা বলছে না। তবু কিকিরা সামান্য সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, "মহিমবাবু তো আমাদের এ-কথা বলেননি?"

"সে আপনারা জানেন। মহিম রাহা আপনাদের কানে-কানে কী বলেছে—আপনারাই বুঝবেন। আমি নয়।" শেখর কঠিনভাবেই বলল।

"ডাক্তার মুখার্জিও একবার বললেন না?"

"দরকার মনে করেননি। বা বলতে চাননি। ধরে আনুন না তাঁকে, দেখি তিনি কী বলেন? ... আপনি ভাববেন না, ভদ্রলোক

আমার ওপর সদয়। আমার ধরণীমামাটি যেমন বোঝাতেন, তিনি তেমনই বুঝতেন। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম!"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনি শেখর গুহনিয়োগী নামে একটা চোরাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখেন। তার কাগজ আমি ..."

"রাখি; ওই নামেই রাখি। ওটাই আমার আসল নাম ও পদবি। ধরণী সেনের নিজের ভাগ্নের পদবিও অবশ্য গুহ। আমি গুহনিয়োগী। আমার বাবা নিয়োগী ছিলেন। মা—যিনি আমায় পালন করেছেন—ধরণী সেনের বিধবা দিদি—তিনি নিজেদের গুহ পদবিটা বাড়তি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো মা ভাবতেন তাতে ভাল শোনাবে।"

কিকিরা তারাপদ আর চন্দনের দিকে তাকালেন। তারাপদ কী মনে করে শেখরকে বলল, " ... আমরা শুনলাম, আপনি বরাবরই মামার অবাধ্য ছিলেন।"

শেখর অস্বীকার করল না। সহজভাবে ঘাড় হেলিয়ে বলল, "ছিলাম। উনি যেমন আমায় পছন্দ করতেন না, আমিও করতাম না। উনি তো মাকে অনেকবার বলেছিলেন—আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। ওঁর কথা ছিল—এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না। মা আমায় ছাড়তে চাননি। মায়ের জন্যেই ও-বাড়িতে থাকতে পারতাম।"

"আপনার নিজের বাবা-মা?" তারাপদ আবার বলল।

"ছেলেবেলা থেকেই কেউ ছিল না। মা মারা যায় অসুখে। বাবা আগুনে পুড়ে। বাবা কারখানায় কাজ করত। কারখানাতেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমি অনাথ হয়ে পড়ি। আমার কেউ ছিল না। ধরণীমামার বিধবা দিদি আমায় নিজের কাছে রেখে পালন করেন। উনি আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন।"

কিকিরা কী ভেবে বললেন, "ধরণীবাবু আপনার জন্যে কিছুই

করেননি—এ-কথা তো ঠিক নয়। আপনাকে সাধ্যমতন ভাল করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি, একসময়ে আপনাকে রঙ কারখানায় কাজে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে আপনি কাজকর্মে মন দেন, নিজে দাঁড়াতে পারেন! তাই না?"

শেখর এবার ঠিক বিরক্ত হল না, বরং একটু হাসল। তারপর বলল, "মহিমদা—ও ভাল কথা, মহিম রাহাকে আমি বরাবরই 'মহিমদা' বলি। 'মামা' বলি না। মহিমদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন ছিল একসময়—শুনবেন নাকি?"

"বলুন!"

"মহিমদা তখনও রঙের দোকানে বসত—স্ট্র্যান্ড রোডে। বড়বাবু মারা গিয়েছেন। ধরণীমামা আমাকে রঙ কারখানায় নিয়ে এলেন। মায়ের জোরাজুরিতে। আমি রঙ কারখানায় এসে স্টোরে বসতাম। জিনিসপত্রের হিসেব রাখতাম। স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে জিনিস পৌঁছে দিতাম। মহিমদার সঙ্গে আমার গলাগলি হল খুব। দু'জনে মিলে বুদ্ধি করে রঙের স্টক গোলমাল করতে শুরু করলাম। মহিমদা রোজই কিছু-কিছু জিনিস টানতে লাগল। খাতায়পত্রে হিসেবে তার আঁচড়ও থাকল না। আমরা দু'জনে সেই টানা জিনিসের টাকা পকেটে পুরতে লাগলাম।"

তারাপদ বে-খেয়ালে বলে উঠল, "চুরি—! এ তো সেরেফ চুরি। নিজেদের জিনিস নিজেই চুরি!"

"আমি কী বলেছি চুরি নয়," শেখর ঠাট্টার গলায় বলল, "পরের জিনিস চুরি করলে লোকে চোর বলে। নিজের জিনিস সরিয়ে দু' পয়সা আড়ালে কামালে তাকে হাতখরচা বলে। ... তা আমার বেলায় তিন-চারশো টাকা হাতে আসত মাঝে-মাঝেই। রঙের দামটাম জানেন! জানেন না। যাক্‌গে, এই চুরি ধরা পড়ল। ধরণীমামা আমাকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিলেন কারখানা

থেকে। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢালতে পারেননি এই যা! অকথ্য গালমন্দ শুনতে হল। মহিমদা কিন্তু সাধুপুরুষ বনে গেল। বলল, সে কিছু জানে না। চুরিচাপাটি যা করার, আমিই করেছি। আমি আর জটাদা। ...”

“জটাকেও তো চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ধরণীবাবু!”

“হ্যাঁ। কেঁদেকেটে সে পার হয়ে গেল। আমি কান্নাকাটি করিনি—হাতেপায়েও ধরিনি, ফলে আমাকে জুতোপেটা খেয়ে

কারখানা ছাড়তে হল, বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিলেন মামা। ... মা আর সহ্য করতে পারলেন না, নিজের ছেলের কাছে চা-বাগানে চলে গেলেন।"

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন।

শেখর বলল, "মহিমদা তো কোম্পানির মালিক—বড় মালিক—চোর হয়েও সে দিব্যি কারখানায় এসে ছোটবাবু হয়ে বসে পড়ল। আর আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

বেশ মজার ব্যাপার ! তাই না ! তখন থেকেই আমি মহিমদাকে বলেছিলাম—তোমায় আমি কিন্তু ছাড়ব না বলে রাখলাম।”

শেখর ঘরের একপাশে সরে গিয়ে জল খেল। সিগারেট ধরাল। বেপরোয়া ভঙ্গি।

কিকিরা বললেন, “তা হলে তো দেখছি, আপনিই রাগ মেটাতে, প্রতিহিংসা মেটাতে ...”

কিকিরাকে কথা শেষ করতে দিল না শেখর। রুক্ষ গলায় বলল, “যা খুশি ভাবতে পারেন আপনারা ! রাগ-প্রতিহিংসা তো থাকবেই। পাঁচজনের সামনে জুতো খাওয়ার আর গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া—অত সহজে ভোলা যায় না।”

“কিন্তু ধরণীবাবু মারা যাওয়ার—”

“মারা যাওয়া— !” শেখর অদ্ভুত গলায় বলল, তার চোখ কুঁচকে উঠেছে।

চন্দন এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি ; চুপচাপ কথা শুনছিল। এবার বলল, “মারা যাওয়া সম্পর্কে আপনার দেখছি খুব আপত্তি !”

“হ্যাঁ, খুবই আপত্তি !”

“কেন ! ডাক্তারবাবু বলছেন, আচমকা হলেও ধরণীবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়।”

“আমি তা মনে করছি না।”

কিকিরা বললেন, “আপনি যে তা মনে করছেন না—আমরা জানি। খবরের কাগজে আপনি সেটা বোঝাবারও চেষ্টা করেছেন। ওই লেখাটা তো আপনিই ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ?”

“আমিই করেছি।”

“কেন ? মহিমবাবুকে ভয় দেখিয়ে রাখার জন্যে ! অন্য পাঁচজনের যাতে চোখে পড়ে—তার জন্যে ?”

"যা মনে করেন আপনারা।"

"আমরা তো মনে করছি, ভয় দেখিয়ে আপনি টাকা রোজগারের ব্যবস্থা ভালই করে নিয়েছেন।"

"খাঁটি কথা," শেখর মুখ টিপে হাসল। "আমার তো মশাই রঙের কারখানা নেই, বাড়ি নেই কলকাতায়, গাড়ি নেই, টাকা গচ্ছিত নেই ব্যাঙ্কে। ধরণী সেন আমায় দু' পয়সা দিয়েও যাননি। ... টাকা কার না দরকার ! আমারও দরকার বইকি !"

চন্দন বলল, "তা বলে আপনি অনর্থক একজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা রোজগার করবেন !"

"অনর্থক যদি হয়—তবে সে ভয় পাচ্ছে কেন ! যান না—তাকে গিয়ে বোঝান অনর্থক ভয় না করতে।"

কিকিরা এবার উঠে দাঁড়ালেন। ধীর গলায় বললেন, "শেখরবাবু, আপনি দাবার চালটা চেলেছেন আপনার মাথা খাটিয়ে। পালটা চালের কথা ভাবেননি। ... আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

হোটেল থেকে বেরুবার আগে কিকিরা তারাপদকে বললেন, "তারা, একবার অফিস-ঘর ঘুরে আসছি ; তোমরা এগোও।"

তারাপদরা বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তায়।

এই হোটেল-পাড়াটা নানা ধরনের মানুষের। আশেপাশের দোকানগুলোও যেন সাধারণ পাড়ার মতন নয় ; কোথাও পাঞ্জাবি খানাপিনার দোকান, কোথাও চিনে ছেলেরা জটলা করছে, চা-শরবতের ব্যবস্থা, বেশ জাঁকালো পানের দোকান—এন্তার ঠাণ্ডিপানি আর পান বিক্রি হচ্ছে, কোথাও বা একনাগাড়ে রেকর্ড বাজছে হিন্দি গানের। ওরই মধ্যে মামুলি এক ডিসপেনসারি, এমন কি, ফলের দোকানও।

এখন রাত নয়।। সন্ধে শেষ হয়ে আসছে। দু-একটা সাধারণ দোকান বন্ধ হয়ে এল।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "চাঁদু, কী বুঝছিস ?"

চন্দন প্রথমে কোনও জবাব দিল না কথার, পরে বলল, "কী বুঝব ! দুই-ই সমান।"

"মানে ?"

"যেমন মহিমচন্দ্র, তেমনই শেখর। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি আর কী !"

"যা বলেছিস ! কিকিরা বড় প্যাঁচে পড়ে গেছেন।"

চন্দন কিছু বলার আগেই কিকিরা এসে পড়লেন।

"নাও, চলো।" কিকিরা বললেন।

তিনজনে হাঁটতে-হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে আসার পর তারাপদ বলল, "স্যার, এর পর— ?"

কিকিরা অন্যমনস্ক ছিলেন। জবাব দিলেন না।

চন্দন বলল, "কিকিরা, আপনি বরং মহিমকে বলুন : পেটে কথা রেখে মুখে শেখরকে 'ব্ল্যাকমেইলার' বলে লাভ নেই। সাফসুফ কথা বলতে বলুন। মহিম যে নিজেও সাধুপুরুষ নয়— এ তো জানতেই পারলেন।"

তারাপদ বলল, 'নিজেদের কোম্পানির জিনিস নিজেই টানত। ডেঞ্জারাস !"

কিকিরা কোনও জবাব দিলেন না।

হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম রাস্তা।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "চাঁদু, জটার অ্যাক্সিডেন্টটা কবে যেন হয়েছে ?"

চন্দন নির্দিষ্ট করে দিনক্ষণ বলতে পারল না।

তারাপদ বলল, "এই তো গত হপ্তায়। আপনাকে না বললাম

সেদিন।

"কাগজে সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্টের নোটিসটা বেরুবার পর-পর। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় যেন হয়েছে?"

চন্দন বলল, "বলছে তো মিশন রো-য়ে। তাই শুনেছি।"

"জটার বাড়ি কোথায়?"

"কলুটোলা।"

"যাঃ, কলুটোলা নয়—বউবাজার," তারাপদ বলল।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। সামান্য পরে বললেন, "মহিমচন্দ্র বড় অদ্ভুত মানুষ! জটার অ্যাক্সিডেন্টের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন না সেদিন। আমি যখন বললাম, উনি শুধু বললেন—হ্যাঁ, গাড়ির দরজা খুলে পড়ে গিয়েছিল শুনলাম। হাত-পায়ে খানিকটা চোট লেগেছে। ... পরে যখন শুনলেন, ও নার্সিং হোমে আছে—তখন অবাক হয়ে বললেন, সে কী! কে ওকে নার্সিং হোমে ভরতি করল? আমি তো করিনি। তারপর যখন শুনলেন, শেখর জটাকে নার্সিং হোমে ঢুকিয়েছে, তখন কেমন নার্ভাস হয়ে গেলেন।" কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী ভাবছিলেন কে জানে! শেষে আচমকা বললেন, "চাঁদু, জটাই আমাদের চাবিকাঠি। হ্যাঁ, জটা। ... ওর দায়িত্ব তোমার। ওকে ছাড়বে না। যা সম্ভব সবই করবে।"

মহিমচন্দ্রকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। তিনি কোনও কথাই যেন আর বলতে পারছেন না।

কিকিরারা আজ অনেকক্ষণ হল এসেছেন মহিমের বাড়িতে। তখন আর আলো নেই। সন্ধেও হয়নি পুরোপুরি। খানিকটা আগে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ঘূর্ণি উঠেছিল। ঝড়ও হয়েছে এক দমকা। আকাশ মেঘলা ; আবহাওয়াও গুমোট।

মহিমের বসার ঘরে অনেকক্ষণ ধরেই কথাবার্তা হচ্ছিল। কিকিরা আর তারাপদ সামনে বসে। চন্দন নেই।

কিকিরা বললেন, "শেখরের সব কথাই আপনাকে বলেছি। সে যা বলেছে, আপনি অস্বীকার করতে পারেন ? শেখর যে ধরণীমোহনের নিজের ভাগ্নে নয়, এটা তো ঠিকই !"

মহিমচন্দ্র সামান্য মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ।

"ধরণীমোহন তাকে কখনওই নিজের আত্মীয়-পরিজন বলে মেনে নিতে পারেননি, এটাও ঠিক !"

"হ্যাঁ।"

"শুধু দিদির জন্যে কাছে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন ?"

"শেখর নিজেও ভাল ছিল না। মেজোবাবুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত না। বড় অ্যারোগান্ট ছিল।"

"সে অন্য কথা। তার স্বভাব।... এটাও আপনি স্বীকার করবেন যে, কোম্পানির জিনিস কারখানা থেকে সে বের করে নিত খাতাপত্রে না দেখিয়ে। মানে দোকানে জিনিস নিয়ে যাওয়ার

সময় চুরি করত। আর আপনি তখন দোকানে বসতেন। চোরাই জিনিস বিক্রির টাকা দু'জনে ভাগবাটরা করতেন!"

মহিমচন্দ্র মাথা নিচু করে নিলেন।

"আচ্ছা মহিমবাবু, আমি ধরে নিচ্ছি যে, অন্যায়টা আপনারা ভাগাভাগি করে করতেন। কিন্তু আপনি নিজেও যে-অন্যায় করতেন, সেই একই অন্যায় কাজ করার জন্যে যখন ধরণীবাবু শেখরকে পাঁচজনের সামনে অপমান করে তাড়ালেন—তখন একটা কথাও কেন বললেন না?"

ইতস্তত করে মহিমচন্দ্র বললেন, "বলে লাভ হত না। মেজোবাবু শেখরকে রাখতেন না।"

"আপনার দাদা তখন বেঁচে?"

"প্রাণে বেঁচে ছিলেন—তবে অসুস্থ। হার্টের রোগ ছিল। তিনি মারাও যান মাস কয়েক পরে।"

"তার মধ্যেই আপনি দোকান ছেড়ে কারখানায় চলে এসেছেন।"

"এসেছি।"

"জটা—জটিলেশ্বরকে তা হলে কে বাঁচাল? আপনি, না আপনার দাদা?"

"জটা মেজোবাবুর হাতে-পায়ে ধরেছিল। আর—"

"আপনিও বলেছিলেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"জটার অবস্থা ভাল নয়। চাকরি গেলে..."

কিকিরা একটু বাঁকা করে হাসলেন, "তা ঠিক নয় মহিমবাবু! জটাকেও আপনারা দু'জনে—শেখর আর আপনি চোরাই জিনিসের ভাগবাটরা থেকে টাকা দিতেন। দিতেন, কেননা সে

শুধু ভ্যান নিয়ে দোকানে আসত না—আপনাদের চোরাই কাজে পার্টনার ছিল। ...ওকে হাতে রাখায় আপনার লাভ হবে ভেবেছিলেন।"

মহিমচন্দ্র চুপ করে থাকলেন।

কিকিরা একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন। যেন সময় নিলেন কথা বলার। পরে বললেন, "জটা আপনার লোক, না, শেখরের ?"

"আমার কারখানায় কাজ করে। লোক আমার।"

"না, না, তা বলছি না। বলছি, কার দলে সে ? আপনার, না শেখরের ?"

অল্পসময় চুপচাপ থাকার পর মহিমচন্দ্র বললেন, "এখন দেখছি, শেখরের। আগে এতটা বুঝিনি। মেজোবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে সে যে শেখরের লোক হয়ে যাবে পুরোপুরি—বুঝতে পারিনি।"

কিকিরা কথা পালটালেন, "জটার অ্যাক্সিডেন্টের খবর আপনি আগে আমাদের বলেননি কেন ?"

"বলার মতন কী ছিল রায়মশাই! কলকাতার রাস্তায় লোকে হোঁচট খেয়ে পড়বে, গাড়ির খোলা দরজায় হেলান দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে—একে কি অ্যাক্সিডেন্ট বলে! আমি শুনেছিলাম, জটা দোকান থেকে পান কিনে মুখে পুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আমাদের ভ্যানগাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে। সামনের চাকা হঠাৎ গড়িয়ে যায়। টাল সামলাতে না পেরে সে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। হাতে-পায়ে লেগেছিল সামান্য। ব্যস। একে অ্যাক্সিডেন্ট বলে ?"

"ভ্যানটা ফিরিয়ে আনল কে ?"

"কেন, শাটুল। শাটুল তো ভ্যানেই থাকে। জটার হেল্পার। গাড়ি চালাতেও পারে। সে তো সঙ্গেই ছিল।"

"জটার কাছ থেকে আপনি কোনও খবর পাননি ?"

"শুনেছিলাম, হাত-পা ছড়ে গিয়ে খুব ব্যথা হয়েছে, একটা হাতের কব্জি মুচড়ে গিয়েছে। সে বাড়িতেই আছে।"

"তাকে দেখতে যাননি ?"

"না।"

"আপনি তাকে দেখতে গেলেন না, অথচ শেখর তাকে নিয়ে নার্সিং হোমে ভরতি করিয়ে দিল !"

"তাই তো শুনলাম আপনাদের মুখে।"

"তারপরও— ।"

"না, আমি নার্সিং হোমে যাইনি। কেন যাব ? জটার যদি অতবড় জখম হত, সে আমায় জানাতে পারত না লোক দিয়ে ? আমি তাকে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম না ? না, বড় ডাক্তার দেখাতে পারতাম না ! ...রায়মশাই, একটা কথা বলি—মনে কিছু করবেন না। জটার এই নার্সিং হোমে যাওয়ার ব্যাপারটা প্ল্যান করে করা। সাজানো।"

কিকিরা আর তারাপদ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিকিরা বললেন, "কেমন করে বুঝলেন ?"

"বুঝলাম। বুঝলাম, শেখর যখন এই ক'দিন আগে আবার আমায় বাড়িতে ফোন করে হঠাৎ হাজার পনেরো টাকা চাইল। বলল, জটার জন্যে দরকার। শেখর টাকা চেয়েছিল এ-কথা আপনাকে আমি বলেছি।"

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, "বলেছেন। আমিও শেখরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, টাকা আর সে পাবে না।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "শেখর ভয় পাওয়ার ছেলে নয়।"

"এবার পাবে।"

"কেমন করে ?"

"ব্যবস্থা করেছি। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন! দেখতেই পাবেন।"

ঘড়িতে আটটা বাজতে চলেছে, চন্দন এল। সঙ্গে জটিলেশ্বর।

জটিলেশ্বরকে দেখে মহিমচন্দ্র চমকে গেলেন। "এ কী, তুই?"

জটিলেশ্বর একটিও কথা বলল না। তার পরনে পাজামা, গায়ে শার্ট। বাঁ হাতের কব্জির কাছে একটা ব্যান্ডেজ। তাকে দেখে মনে হল না, সে মাথায় চোট নিয়ে নার্সিং হোমে শুয়ে ছিল এ-ক'দিন।

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "সব ব্যবস্থা ঠিক-ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ। মনোজদা নার্সিং হোমকে যা-তা বলেছে। ওদিকে আবার মনোজদার বন্ধু লালবাজারে পুলিশের বড় অফিসার। লাহিড়ী সাহেব। ফোন তুলে নার্সিং হোমে ধমক মারতেই সব ঠাণ্ডা। নার্সিং হোমটা লোক লুকিয়ে রাখার জায়গা নয়। ওদের মালিকরা ঝামেলায় পড়ে গেছে। আমি জটিলেশ্বরকে নার্সিং হোম থেকে নিয়ে চলে এসেছি। অবশ্য খাতাপত্রে লেখাপড়া করে। জটিলেশ্বরও লিখে দিয়েছে, সে স্বেচ্ছায় নার্সিং হোম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার কোনও কমপ্লেন আর নেই।"

জটিলেশ্বর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল মুখমাথা নিচু করে।

কিকিরা জটিলেশ্বরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তোমায় আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। কথা ঘোরাবে না, মিথ্যে কথা বলবে না!"

জটিলেশ্বর মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরা বললেন, "মেজোবাবু যেদিন মারা যান—সেদিন

বিকেলের গোড়াতেই কারখানার ডেলিভারি ভ্যান আর মেজোবাবুকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও ?”

“হ্যাঁ, স্যার।”

“সঙ্গে আর কে ছিল ?”

“কেউ নয়।”

“কোথায় যাও ?”

“আমাদের বড় দোকানে।”

“সেখানে কী হয় ?”

“মেজোবাবু দোকানে যান। দোকানের লোক এসে গাড়ি থেকে কিছু জিনিস নামিয়ে নিয়ে যায়।”

“আরও জিনিস ছিল ?”

“না বোধ হয়।”

“দোকানে কতক্ষণ ছিলেন মেজোবাবু ?”

“বিশ-পঁচিশ মিনিট, বড়জোর আধঘণ্টা।”

“তারপর তোমরা কোথায় যাও ?”

“ডেকার্স লেন-এ যেতে বলেন মেজোবাবু।”

“ডেকার্স লেন-এ কোথায় ?”

“একটা বাড়িতে। পুরনো বাড়ি। পাশে ভাঙাচোরা গ্যারাজ।”

“কার কাছে ?”

“আমি জানি না।”

“আগে কোনওদিন সেখানে যাওনি ?”

“না স্যার।”

“সেখানে মেজোবাবু কতক্ষণ ছিলেন ?”

“ওই আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট।”

“তারপর ফিরে এসে গাড়িতে বসলেন ?”

"হ্যাঁ, আমার পাশেই। আমাদের ভ্যানগাড়িতে সামনেই যা বাড়তি দু-একজন বসতে পারে। পেছনে বসার জায়গা নেই।"

"মেজোবাবু বসার পর—তোমরা চলে এলে ?"

"না। যখন চলে আসছি তখন একটা লোক এসে একপাতা ওষুধ দিল, গোলাপি-গোলাপি দেখতে। মেজোবাবুর হাতে দিল। সেইসঙ্গে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর ছোট মতন এক ইঞ্জেকশনের শিশি—ওই যেগুলো ভেঙে-ভেঙে ইঞ্জেকশন দেয়...। চন্দনবাবুকে আমি সব বলেছি স্যার।"

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

চন্দন একটু অপেক্ষা করতে বলল। তারপর পকেট থেকে নতুন একটা ডিসপোজাল সিরিঞ্জ, একটা ইঞ্জেকশনেব অ্যাম্পুল, আর একপাতা নতুন ওষুধ বের করল।

বড়-বড় ট্যাবলেট। আসবার সময় কিনে এনেছে। কিনে এনেছে, কারণ আগেই নার্সিং হোমে পুলিশের ভয়ে জটিলেশ্বর বলে ফেলেছিল ঘটনাগুলো।

চন্দন বলল, "এইরকম সিরিঞ্জ ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর—?"

"আমরা চলেই আসছি, লোকটা মেজোবাবুকে বলল, সে যতটুকু মেশাবার, মিশিয়ে দিয়েছে। যদি দরকার হয়, ব্যথা না কমে, আরও একটু করে মিশিয়ে নিতে।"

"জিনিসটা কী ?" তারাপদ বলল।

"আমি জানি না।"

কিকিরা বললেন, "তারপর ?"

"তারপর গাড়ি ছাড়লাম। মাঝপথে মেজোবাবু আমায় গাড়ি

দাঁড় করাতে বললেন। গাড়ি দাঁড় করালাম। মেজোবাবু দেখলাম—ইঞ্জেকশনের শিশিটা ভেঙে ফেললেন। তার আগেই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা বের করে নিয়েছেন। ওষুধ ভরলেন সিরিঞ্জে।"

"তারপর?"

"ওষুধের পাতার পেছনদিকের পাতলা কাগজের মতন রাংতাটায় ছুঁচের মতন ফুটো করে ওষুধ দিতে লাগলেন। সবক'টা বড়িতেই। ওই নতুন পাতা থেকে দুটো বড়ি আগেও তিনি খেয়েছিলেন।"

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "চাঁদু, ব্যাপারটা কী?"

চন্দন তার হাতের ডিসপোজাল সিরিঞ্জ গুছিয়ে নিল, ওষুধ ভরে নিল ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল থেকে। তারপর তার কিনে আনা ট্যাবলেটের পাতার পেছনদিককার পাতলা রাংতার ভেতর দিয়ে দু-তিনটে বড়িতে ওষুধ ছড়াল।

তারাপদ বলল, "হলটা কী?"

চন্দন বলল, "এই সিরিঞ্জের ছুঁচের মুখ এত সরু যে—কারও বোঝার সাধ্য নেই, রাংতার ভেতর দিয়ে ওষুধ ঢোকানো হয়েছে। এই নিড্‌ল—মানে ছুঁচের গর্ত চোখেও দেখা অসম্ভব!"

কিকিরা জটিলেশ্বরকে বললেন, "তুমি নিজের চোখে এটা করতে দেখেছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মেজোবাবু সেই সিরিঞ্জ আর ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল কী করলেন?"

"নামার সময় গাড়িতে ফেলে রেখেই চলে গেলেন।"

"ট্যাবলেটের পাতাটা?"

"মেজোবাবুর জামার পকেটেই থাকল।"

"তুমি সেই ভাঙা সিরিঞ্জ আর ভাঙা অ্যাম্পুল নিয়ে কী করলে ?"

"কী করব। গাড়িতে পড়ে থাকল।"

"পড়ে থাকল ! সত্যি কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"শেখরকে দাওনি ?"

"না, না। শেখরদাকে কেন দেব ! আমি কী অত বুঝেছি !"

"কবে বুঝলে ?"

"মেজোবাবু মারা যাওয়ার পর। আমার কেমন সন্দেহ হল। কারখানায় এসে দেখি, গাড়ির মধ্যে সেটা পড়ে আছে। আমি নিয়ে গিয়ে ছোটবাবুকে দিলাম।" বলে মহিমচন্দ্রের দিকে তাকাল। মহিমচন্দ্র চুপচাপ। "শ্রাদ্ধের দিন কাজের ভিড়ের মধ্যে শেখরদাকে দেখেছি। তখনও কিছু বলিনি। পরে নিয়মভঙ্গের দিন কথায়-কথায় বলেছিলাম শেখরদাকে।"

কিকিরা মহিমন্দ্রের দিকে তাকালেন।

মহিমচন্দ্র বললেন, "জটা ঠিকই বলছে।"

কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন। "চাঁদু, কী ব্যাপার ! আমার তো মাথায় ঢুকছে না। ট্যাবলেটের স্ট্রিপ ফুটো করে ইঞ্জেকশনের ওষুধ ঢালা ! এ তো জীবনে শুনিনি !"

চন্দন বলল, "আমিও শুনিনি। জানতাম না।"

"কিন্তু কী মেশানো হত ট্যাবলেটে ?'

চন্দন বলল, "কেমন করে বলব ! মনে হয়—মনে হয়—অ্যাপারান্টলি কোনও পেইন কিলার ড্রাগ। মরফিন, কোকেন কত কী হতে পারে। কিংবা হতে পারে কোনও নেশা—নেশার জিনিস !"

মহিমচন্দ্র হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন, "রায়মশাই,

একটা কথাই আপনাকে আমি বলিনি। বলতে লজ্জা করেছে। মেজোবাবু শেষের দিকে কোনওরকম নেশা করতেন। সন্দেহ হত আমার। অফিসে মাঝে-মাঝেই কেমন ঝিম মেরে থাকতেন, আর ওষুধ খেতেন। বলতে পারতাম না। সে সাধ্য আমার ছিল না। সত্যি বলতে কী, আমার এইরকম একটা কথা মনেও হত। মনে হত, কোনও নেশার বিষ বেশি খেয়ে ফেলে মেজোবাবু ওইভাবে হঠাৎ মারা গেলেন। আত্মহত্যা করাও বলতে পারেন। এই কথাটাই আপনাকে আমি কোনওদিন বলিনি। ...আমি আর যাই হই, মেজোবাবুকে ভয় পেতাম। খাতির করতাম। উনি মানুষ হিসেবে একদিকে যেমন ভাল ছিলেন—অন্যদিকে বদরাগী, ক্ষ্যাপাটে। অভিমানী। ...আপনাকে আমি সত্যি বলছি—ওই জিনিসগুলো আমি ফেলে দিয়েছি। তখন বুঝিনি, শেখর আমাকে ওই ব্যাপারটা নিয়ে প্যাঁচে ফেলতে পারে।"

কিকিরা শুনলেন। তারপর উঠে, ঘরে রাখা টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

বারকয়েক পরে সাড়া পাওয়া গেল।

"নিউ সেন্ট্রাল হোটেল? একবার শেখর গুহনিয়োগীকে ডেকে দেবেন? ভেরি আর্জেন্ট। নার্সিং হোম থেকে বলছি।"

ঘরে সবাই চুপ। মহিমচন্দ্র যেন চোখের পাতাও ফেলছিলেন না।

খানিকটা পরে সাড়া পাওয়া গেল।

"শেখরবাবু?"

শেখর সাড়া দিল ও-প্রান্তে।

"একটা কথা জানাবার ছিল। আমি কিকিরা। আমরা মহিমবাবুর বাড়ি থেকে কথা বলছি। জটিলেশ্বর এখন আমাদের সামনে। তার একটা বয়ান মহিমবাবু পুলিশের দপ্তরে পাঠিয়ে

দিতে পারেন রেকর্ড রাখার জন্যে—যদি তিনি মনে করেন ! ...তা মোদ্দা কথাটা হল, আপনি এর পর আর ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবেন না বোধ হয়। বরং যে টাকাগুলো নিয়েছেন... ও কি মশাই ফোন ছেড়ে দিচ্ছেন যে ! শুনুন— শুনুন— .”

শেখর ওপাশে ফোন ছেড়ে দিল।

কিকিরা ফোন রেখে মহিমচন্দ্রকে বললেন, “স্যার, আপনি আপাতত নিশ্চিন্ত। শেখর আর আপনাকে জ্বালাবে না। তার তুরুপের তাস এখন আমাদের হাতে।” বলে কিকিরা হাসলেন।